চোরাবালি

আমাদের প্রথম দেখাটা এ বছরের শুরুতে কর্মস্থলে। আর প্রথম দেখাতেই মানুষটাকে আমার প্রচণ্ড ভালো লেগে যায়। সে খুবই সুদর্শন এক পুরুষ যার শুধু শারীরিক সৌন্দর্যই নয়, আছে চমৎকার ব্যক্তিত্ব। সাধারণত নিজে থেকে কারো সঙ্গে পরিচিত হতে চাই না। কিন্তু তার সঙ্গে পরিচিত হবার লোভটা কিছুতেই সংবরণ করতে পারিনি। তাই একদিন নিজে থেকেই তার সঙ্গে পরিচিত হতে সচেষ্ট হই।

নাম পরিচয় জানার মধ্যেই প্রথম দিনের আলাপটাকে সীমাবদ্ধ রাখি।

কয়েকদিন যেতেই এক সহকর্মীর মাধ্যমে জানতে পারি আমার অতি পছন্দের মানুষটি বিবাহিত।

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খাই। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিই আর ভাগ্যকে দোষারোপ করি।

কর্মস্থল এক হওয়ায় প্রায় প্রতিদিনই তার সঙ্গে দেখা হয়। কখনো হেসে শুভেচ্ছা বিনিময় করি, কখনোই বা দুই একটা কথা বলে দুষ্টুমি করি।

আমি এমনিতে খুবই হাসি-খুশি এবং মিশুক প্রকৃতির মেয়ে। তাই একদিন হাসতে হাসতে তাকে বিবাহিত না জেনে পছন্দ করার কথাটা বলে ফেলি।

সেও বিষয়টা জেনে খুব মজা পায় এবং হেসে হালকাভাবে নেয়।

পদমর্যাদায় সে আমার চেয়ে উপরে এবং অন্য সেকশনের হওয়ায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সব সময় কথা বলার সুযোগ হয় না। তাছাড়া সে বিবাহিত এবং আমি অবিবাহিতা হওয়ায় এক সঙ্গে কিছুক্ষণ সাধারণ কথাবার্তা বলারও সাহস করি না পাছে সহকর্মীদের মনে কোনো সন্দেহের সৃষ্টি হয়। আমরা দুজনই সহকর্মীদর কাছে যথেষ্ট ভদ্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হিসেবে পরিচিত। তার ওপর মান-সম্মানের বিষয়টা জড়িত। তাই প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কথাবার্তা বলায় খুব সতর্ক থাকি এবং অবশেষে কথা বলার মাধ্যম হিসেবে আমরা মোবাইল ফোনকে বেছে নিই। কখনো ও ফোন করে, কখনো বা আমি। আমাদের কথা হয় দীর্ঘক্ষণ।

খুবই মজা করে কথা বলে সে। সব কথাই থাকে দুষ্টুমিতে ভরা আর আমাকে কনফিউজড করার চেষ্টা।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর কথা শুনি আর এক তীব্র ভালো লাগায় আমার সমস্ত মন ভরে যায়। না, সে আমাকে কখনো কোনো ভালোবাসার কথা বলেনি। তবে ওর দুই চোখে আমার প্রতি এক ভালো লাগার অনুভূতি স্পষ্ট দেখতে পেতাম। আমাকে একটু দেখার অস্থিরতা, আমার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ ওর মাঝে খুজে পেতাম।

এভাবেই আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তগুলো স্বপ্নের মতো কাটতে থাকে। তার প্রতি আমার ভালো লাগা আরো তীব্র হয়। কিন্তু সে বিবাহিত এই বাধার প্রাচীর আমার সব ইমোশন গুলোকে সব সময় সংযত রাখে।

আমাদের আলাপ পরিচয়ের বয়স প্রায় এক বছর হতে চললো। এই দীর্ঘ সময়ে সে আমাকে তুমি করে বললেও কখনো তার কাছে তুমি করে ডাকার অধিকার দাবি করিনি, একটি দিনের জন্যেও কোথাও তার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি, এমনকি কোনো কফি হাউসে বসে এক কাপ কফি খাবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিনি। মাঝে মধ্যে সে এক-আধটু দেখা করার আবদার করলেও সম্মানহানির ভয়ে প্রশ্রয় দিইনি। এ কারণে সে আমাকে *শীতল* বলে অপবাদ দিলেও মেনে নিয়েছি। আমাদের সম্পর্কটা শুধুই ফোন আলাপ আর আমি তার প্রতি প্রচণ্ড দুর্বল থাকা সত্ত্বেও আমার তীব্র ভালো লাগাকে কোনো সম্পর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ করতে চাইনি। শুধু চেয়েছি ওর প্রতি আমার আজকের এই মুগ্ধতা, ভালো লাগা সারা জীবন আজকের মতোই সতেজ ও বিশুদ্ধ থাকুক।

কিন্তু মানুষ চাইলেই সব কিছু তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। আমিও পারিনি।

দিনে দিনে ওর প্রতি আমার এই ভালোলাগা ভালোবাসায় রূপ নেয়। বুঝতে পারি তখন যখন ওকে একদিন না দেখলে আমার সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়, একদিন কথা না বলতে পারলে আমার বুকের ভেতর

রক্তক্ষরণ হয়। তাকে বলতে পারি না *ভালোবাসি*। প্রতিদিন কর্মস্থলে পা দিয়েই ওকে দেখার জন্য ছটফট করি। ওর একটা ফোনের জন্য প্রতিদিন পাগলের মতো অপেক্ষা করি।

ইদানীং ওর পেশাগত ব্যস্ততা আর জটিলতার কারণে আমাদের দেখা হয় অনেক কম। ফোনও করে না তেমন। আমি ফোন করলে অবশ্য কথা বলে। জানি না সে ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে কি না? কিন্তু কেন? তার কাছে তো আমর কোনো দাবি–দাওয়া, চাহিদা নেই, কোনো সম্পর্কের শক্ত বাধনে জড়ানোর আকাঙ্ক্ষা নেই, এমনকি তাকে একটু ছুয়ে দেখার অভিলাষটুকু পর্যন্ত নেই। চেয়েছি তার সঙ্গে সারা জীবন একটা সুন্দর সম্পর্ক থাক। আমি তো শুধু তাকে একটু দেখা এবং কথা বলা এই দুটো জিনিসের জন্য তৃষ্ণার্ত। এর বেশি কিছু নয়।

ও আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ। আমার দ্বারা তার পারিবারিক, সামাজিক কিংবা পেশাগত কোনো ক্ষতি হোক তা কখনোই চাই না। আমি এক নারী হয়ে অন্য নারীর চোখের জল হয়ে ঝরতে চাই না। তাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসি। ভালোবেসে যেতে চাই সারা জীবন।

এ দেশের শীর্ষ একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা শেষ করেছি। কর্মজীবনেও প্রবেশ করেছি কয়েক বছর। এই সময়ে দুই একজনকে সাময়িক ভালো লাগলেও ভালোবাসিনি কাউকে। যে আমি পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু–বান্ধব, সহকর্মী সবার কাছে অসম্ভব ভালো মেয়ে হিসেবে পরিচিত সেই আমি কি না ভালোবাসি একজন বিবাহিত মানুষকে! আমার এ অতি গোপন কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারি না। আজ আমার দিন কাটে বুক ভরা কষ্টে এবং রাত কাটে চোখের জলে ভেসে।

ওর একটা আপন পৃথিবী আছে যে পৃথিবীতে গেলে ও আমার কথা ভুলে যায়। কিন্তু আমার ছোট্ট পৃথিবীতে তো ও ছাড়া অন্য কেউ নেই। ওর প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। হঠাৎ কেন ও নিজেকে দূরে সরিয়ে নিল, ওর চোখের ভাষা কেন বদলে গেল সে প্রশ্নের উত্তরও কখনো জানতে চাই না। বরং তার কাছে কৃতজ্ঞ যে, আমার ছোট্ট জীবনে সে আমাকে অসাধারণ কিছু কথা, কিছু সুন্দর মুহূর্ত এবং কিছু মধুর স্মৃতি উপহার দিয়েছে।

পরিচয়ের প্রথম দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত তার বলা প্রতিটি কথা আমাকে সারাক্ষণ ওকে মনে করিয়ে দেয়। আমি তো জেনেশুনেই এ বিষ পান করেছি। সান্ত্বনা এটুকু যে, কোনো পাপ, কোনো স্বার্থ আমার ভালোবাসাকে স্পর্শ করেনি। তাকে না পাওয়ার বেদনা নয়, তাকে হারানোর ভয় আমাকে সারাক্ষণ তাড়িয়ে বেড়ায়।

বদলি সূত্রে সে যেকোনোদিন আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে, ভুলে যাবে চিরদিনের মতো। কিন্তু আমি! ভুল করে যে চোরাবালিতে পা রেখেছি সেখানে প্রতিদিন একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছি। হয়তো একদিন তলিয়ে যাবো। শেষ হবে একটা জীবনের। কেউ জানবে না তার কারণ।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

সুখী প্রেমিক

– মোহাম্মদ স্বপন মাহমুদ আমজাদ

২০০২ সালের কথা। আমি সিমাকে খুব ভালোবাসি। সেও আমাকে জীবন দিয়ে ভালোবাসে।

একই গ্রামে দুজনের বাড়ি থাকায় প্রতিদিনই দেখা হতো সিমার সঙ্গে। সিমাদের বাড়ির কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি।

একদিন বিকেলে আমার বন্ধু সজলদের বাড়িতে যাই। বন্ধুর রুমে বাসার পরই আরম্ভ হলো বৃষ্টি, অবিরাম বৃষ্টি। হঠাৎ রুমের দরজায় করাঘাতের শব্দ। আমি উঠে দরজা খুলে দেখি ছাতা মাথায় সিমা।

তারপর দরজা বন্ধ করে ওকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লাম। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে প্রায় দুই ঘন্টা ছিলাম। তখনই বললাম, সিমা, কাল তো ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস, চলো কাল তোমাকে নিয়ে ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াবো।

কথামতো নির্দিষ্ট জায়গায় সিমা এলো। তার পাশে দেখি একটি ছোট ছেলে। ছেলেটির বয়স চার হবে।

বললাম, ছেলেটি কে?

ও আমার ছোট ভাই। নাম নয়ন। নয়নকে নিয়ে খালাম্মাদের বাড়িতে বাবার কথা বলে বাড়ি থেকে এসেছি।

হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ডে সিমা।

ঠিক আছে। এই নাও, অনেক ঘুরে মানিব্যাগটা পছন্দ করে কিনেছি।

শুধু মানিব্যাগ? ভেতরে মানি নেই?

আছে। পাচশ টাকার একটা নোট আছে।

থ্যাংকস ডারলিং।

হয়েছে হয়েছে। এবার দয়া করে একটা রিকশা নাও। তারপর তোমার যেখানে ইচ্ছে আমাকে নিয়ে উদ্ধার করো।

রিকশায় সিমার পাশে বসে পৃথিবীর সুখী প্রেমিক বলে মনে হচ্ছে নিজেকে। আমার মতো প্রেমিকের এমন সুন্দরী প্রেমিকা!

সিমা এমনিতেই সুন্দর, তারপর আজকের এই সাজে তাকে আরো বেশি সুন্দর করে তুলেছে। নাভির অনেক নিচে শাড়ি পরেছে। পাতলা ফিনফিনে কৃম কালারের শাড়ি ভেদ করে তার কাচা হলুদের মতো গায়ের রঙ ফুটে বের হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দেখি একটি ফুলের দোকান। রিকশা থামিয়ে আমি এবং সিমার ছোট ভাই নয়ন গেলাম ফুল আনতে।

সিমা রিকশায় বসে রইলো।

হঠাৎ দেখি দুটি ছেলে হাতে ফুল নিয়ে সিমার কাছে এলো।

প্রথমে আমি হকচকিয়ে গেলাম। তারপর মনে হলো, আজ তো ভালোবাসা দিবস। গ্রামের মেয়ে, তেমন কিছু জানে না।

ছেলেরা দুজন সাহস করে এসে বললো, আপা, আপনি কি একা?

সিমা কি করবে বুঝতে না পেরে বোবার মতো তাকিয়ে থাকে।

বিষয়টি আগেই আচ করতে পেরেছিলাম। তাই সিমার ছোট ভাই নয়নকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, যাও, তোমার আপুর কাছে গিয়ে বসো।

সিমার নীরবতায় ছেলেটি আরো এক ধাপ এগোলো। সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ফুলটি আপনার জন্য। নিশ্চয়ই আপনি একা?

এমন সময় বাচ্চাটি সিমার কাছে গিয়ে বসলো।

বাচ্চাটিকে দেখা মাত্রই ছেলেটি বিস্মিত হলো যেন তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো।

তারপর ফুলটি বাচ্চার হাতে দিয়ে *সরি আন্টি* বলে যুবকরা লজ্জায় সটকে পড়লো।

দোকান থেকে জোরে জোরে হাসতে লাগলাম। হঠাৎ শুনলাম আরো হাসির শব্দ। পাশে তাকিয়ে দেখি দোকানের কর্মচারী এবং মালিক বিষয়টি বুঝতে পেরেছে। তাই তাদের মুখেও ভালোবাসার হাসি।

আমরা রিকশায় ওঠার পর সিমা বললো, কোথায় যাবে বলে ঠিক করেছো?

এখনো ঠিক করিনি। তবে তুমি চাইলে মাসুদের আপার বাসায় যেতে পারি। মাসুদ বলছিল, তার আপা–দুলাভাই তাকে বাড়ি পাহারায় রেখে কোথায় যেন যাবে।

বেশ চলো।

মাসুদ একাই ছিল। আপা-দুলাভাই নেই। ফাকা বাসা। ছিমছাম গোছানো। নরম বিছানা দেখে ভেতরে ভেতরে আরো অস্থির হয়ে উঠেছি।

আমাদের রেখে মাসুদ বের হয়ে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, এখন থেকে ঠিক তিন ঘন্টা পর ফিরবো। আমাকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে বললো।

দরজা বন্ধ করে সিমার পাশে এসে বসলাম। সিমা খুব স্বাভাবিকভাবে রিমোট হাতে একটার পর একটা চ্যানেল বদলিয়ে চলেছে। রিমোট হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বিছানায় ছুড়ে ফেলালম। তারপর তাকে দাড় করিয়ে আমার বুকের সঙ্গে শক্ত করে আকড়ে ধরলাম।

এই, কি হচ্ছে? ছাড়ো। আমার দম বন্ধ হয়ে গেল।

না। আজ আর তোমাকে ছাড়ছি না।

সিমার গলা, চিবুক, গালে চুমুতে চুমুতে ভরে দিচ্ছি আর কথা বলছি। তার বুক থেকে শাড়ি পড়ে গেলে আরো হিংস্র হয়ে উঠলাম। আমার অবাধ্য ঠোট কখনো তার বুকে, কখনো পেটে অনবরত চুষে বেড়াতে লাগলো।

সিমার নিঃশ্বাস দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। তার কাছ থেকে কোনো বাধা আসছে না। এই কুসুম কুসুম শীতের মধ্যেও সে বেশ ঘেমে উঠছে।

ভেজা ভেজা ঘাম আর পারভিউমের গন্ধে এক আলাদা মাদকতায় ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি যেন। তার শাড়ির একাংশ মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছে। সেই সঙ্গে তার সুউচু বুকটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে। ঘামে ভেজা মুখখানিতে এক অদ্ভুত আভা ফুটে উঠেছে।

পর মুহূর্তে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলো সে। আমার বুকটাই যেন এই পৃথিবীতে তার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। বেশ কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকার পর আমরা কিছুক্ষণের জন্য অন্য জগতের বাসিন্দা হয়ে গেলাম।

আজ তিন বছর পর যখন এই লেখা লেখছি তখন আমার অর্ধাঙ্গিনী আমাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। সে জানে যায়যায়দিনের *ভালোবাসা* সংখ্যার জন্য আমাদের প্রেমের কাহিনী লিখছি। কিন্তু কি লিখছি তা জানে না। যখন এই লেখা প্রকাশ হবে এবং পড়ার পর তার চেহারা কেমন হবে সেটা ভেবেই আমার মন পুলকিত হচ্ছে।

কেরানীগঞ্জ, ঢাকা থেকে

টেলিফোন ফ্রেন্ড

– কংকা

ভালোবাসা দিবস এলেই আমার সেই ফোন ও ফ্রেন্ডের কথা মনে পড়ে। তখন আমাদের বাসায় মাত্র টেলিফোন এসেছে। রোজ রাতে তার ফোন আসতো।

সে চমৎকার করে কথা বলতো।

আমি মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনতাম।

এভাবে প্রায় দুই বছর পার হয়ে যায় কোনদিকে দিয়ে বুঝতেই পারিনি। তারপর সেই বন্ধু আমাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে যায়।

দেখা করতে চাইনি। কিন্তু কি করা! তার কথা রাখতে হবে।

আমাকে বললো, সে মেরুন শার্ট আর ফেড জিন্স পরে আসবে।

আমি জলপাই রঙ সিল্কের শাড়ি পরে যাবো।

আমাদের বাসার সামনেই একটা শো রুম আছে সেখানেই দেখা করতে যাবো।

কিন্তু হঠাৎ করে আমার কি যেন মনে হলো, আমি শাড়ি না পরে নীল রঙের সালোয়ার-কামিজ এবং ওড়না পড়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর এক মাঝবয়সী, কালো, বেশ মোটা, মাথায় শাদা-পাকা চুল, গালে বেশ গভীর কাটা দাগওয়ালা লোক এলো। দেখে আমার গা শিউরে উঠলো। আমি একটা শোপিস কিনে বের হয়ে এলাম।

বাসায় ফিরে আমার রুমে দরজা বন্ধ করে কেদে-কেটে অস্থির হয়ে গিয়েছি ভয়ে। যদি কখনো ঠিকানা বের করে আমাদের বাসায় এসে ওঠে!

আল্লাহ আমাকে বাচিয়েছে। সে লোক আর কখনো ফোন করেনি। তারপর থেকে বাসায় ফোন এলে ফোন রিসিভ করতে ভয় পাই।

বনানী, ঢাকা থেকে

মিথ্যা মামলা

– ফারিহা

আজ আমার জীবনের ভালোবাসার কথা লিখবো যে ভালোবাসার কথা পৃথিবীর কেউ জানে না শুধু একজন ছাড়া। যার সঙ্গে আমার ভালোবাসার সম্পর্ক সে আমার প্রাণপ্রিয়। যাকে ছাড়া আমার কিছু ভালো লাগে না। যে ছাড়া আমার প্রাত্যহিক কোনো কাজে প্রাণ আসে না। যাকে ছাড়া সব আলো অন্ধকার হয়ে যায়, সব সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যায়। সে হলো আমার স্বামী।

তার সঙ্গে আমার পরিচয় আমাদের বাসাতে। প্রথম সাক্ষাৎও আমাদের বাসায়। তাদের বাসা এবং আমাদের বাসা এক পাড়াতে হওয়াতে প্রায় প্রতিদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হতো ও কথা হতো। এমনি করতে করতে সে আমাকে একদিন একটি চিঠি ধরিয়ে দিল। তাদের পরিবার এবং আমাদের পরিবারের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য থাকায় তার সঙ্গে আমার বিয়ে অসম্ভব ভেবে তার চিঠির উত্তর দেইনি।

মন যদি কাউকে ভালোবাসতে চায় তবে তা আর কোনো বাধায় মানে না। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রতিদিন তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাকে আমার ভালো লেগে গেল। তার ভেতরের সৌন্দর্যকে মন দিয়ে উপলব্ধি করতে লাগলাম। যদিও তার এবং আমার মাঝে পার্থক্য ছিল বিস্তর।

বেশ কয়েকদিন পর তার চিঠির উত্তর দিলাম। এভাবে চিঠি দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে আমাদের ভালোবাসা গভীর হতে লাগলো।

এক সময় অনার্সে ভর্তির জন্য ঢাকায় চলে গেলাম আর সে তার নির্দিষ্ট জায়গায় থেকেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলো। আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ কম হতো। কিন্তু মনের টান দিন দিন বেড়েই যেতে লাগলো। ঢাকা থেকে বাসায় গেলে তার বাসায় গিয়ে দেখা করতাম।

এভাবে কেটে গেল তিনটি বছর। সিদ্ধান্ত নিলাম বিয়ে করবো। সমস্ত লজ্জা, ভয় কাটিয়ে আব্বাকে বললাম আমার ভালো লাগার কথা এবং তাকে বিয়ে করার কথা। পাঠক চিন্তা করুন, কখন একটি মেয়ে তার বিয়ের কথা বাবাকে বলতে পারে!

আমাদের সম্পর্কের কথা জানাজানি হয়ে গেল। আমার ওপর নেমে এলো মানসিক নির্যাতন। প্রেম মানে না কোনো বাধা। বাসার মেইন দরজায় সব সময় তালা বদ্ধ করে রাখতে লাগলো। তবুও খুজতে লাগলাম পালানোর পথ।

এমন পর্যায় তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তবু আমার বিশ্বাস ছিল যদি তার কাছে যাই সে ফিরিয়ে দেবে না।

সুযোগ পেয়ে একদিন ভোরে বাসা থেকে পালিয়ে গেলাম এবং বিয়ে করলাম।

সে যে একেবারে বেকার ছিল তা নয়। ফলে আমাকে বিয়ে করতে তার কোনো কষ্ট হয়নি। কিন্তু কথায় আছে, *অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকিয়ে যায়।* আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হলো। আমার শ্বশুরবাড়ির সবাইসহ আমার স্বামীকে এক নাম্বার আসামি করে মিথ্যা মামলায় জেলে ঢোকালো আমাকে, আমার ননদ-ননদাইসহ বিয়ের পরদিন। এই মিথ্যা মামলা করেছিল আমার বাবা এবং দুলাভাই।

জেলখানায় কেটে গেল আমার পাচ মাস। সে এক দুঃসহ জীবন যাপন যা কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। আমার ননদ-ননদাই দুই মাস পর এবং আমার স্বামী প্রায় চার মাস পর জামিন নিয়ে বের হয়ে গেল।

আমার বাবার জামিনে যাইনি বলে আমাকে আরো এক মাস জেলখানায় থাকতে হলো। আমার মনে হয়েছিল আমি বুঝি আর কোনোদিন এই বদ্ধ প্রাচীর থেকে বের হতে পারবো না। থাকা, খাওয়া, গোসল, রাতে শোয়া সব কিছুতে এতো কষ্ট পেতে লাগলাম যে, পাঠকদের লিখে বোঝানো অসম্ভব। আমার বাবা বাইরের সব কিছু আমার জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

মামলাটি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার লেখা থেকে পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমিই আমার স্বামীকে সুস্থ মস্তিষ্কে গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার বাবা করেছিলেন নারী নির্যাতন ও অপহরণ মামলা। আমার স্বামী বের হওয়ার পচিশ দিন পর আমার শ্বশুর অনেক কষ্ট করে জামিন নিয়ে আমাকে বের করেন।

পাঠক, প্রথম যখন জেল গেট থেকে বের হলাম তখনকার মনের অনুভূতির কথা লেখে বোঝাতে পারবো না। আমার জীবন কেটে যেতে লাগলো বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু আমার প্রাণপ্রিয় স্বামীর সঙ্গে অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ি।

নিষ্ঠুর বাবা-মা বছরের পর বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও আমার কোনো খবর নেননি। আস্তে আস্তে মিথ্যা মামলা একদিন শেষ হয়ে গেল। আমার স্বামী নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পেল।

অনেক কষ্ট এবং পরিশ্রম করে আমার স্বামী আজ সশস্ত্র বাহিনীতে অফিসার পদে কর্মরত। আজ আমার কোনো কিছুর অভাব নেই। খুব ভালো আছি একই সঙ্গে স্বামীর ভালোবাসা এবং দুই বাচ্চা নিয়ে।

চট্টগ্রাম থেকে

সালাম সুনীল গাঙ্গুলী

– জা. ই.

লন্ডনে এসে প্রথম যে বাসাটায় উঠি সেটা এক বাঙালি পরিবারের। তবে কেমন পরিবার সেটা টের পাই কয়েকদিন পর। ভদ্রলোক চাদপুরের আর ধর্মে বৌদ্ধ। দুই সন্তানের জননী মহিলাটি বাংলাদেশের ওই এলাকা থেকে এসেছেন, যে এলাকার এমপি গরিব জনগণের বিশ কোটি টাকা খরচ করে ওআইসি মহাসচিব হতে চেয়ে কিছুদিন লোক হাসিয়েছেন বিস্তর। সম্পর্কে তারা স্বামী-স্ত্রী নন। মহিলার স্বামীর একটি এয়ারলাইন্সে চাকরির সুবাদে কর্মস্থল হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য। কিন্তু মহিলা স্বামীর সঙ্গে ওখানে না থেকে থাকেন লন্ডনে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে। মধ্যপ্রাচ্যে থাকতে ভালো লাগে না তার।

এই ভূমিকা টানার কারণ হচ্ছে, অনেক আগে পড়া সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসের চরিত্র আর ঘটনার সঙ্গে হুবহু মিল পাওয়া যায় আশ্চর্য রকমভাবে। সেই উপন্যাসটিও বাস্তব ঘটনার ছায়া অবলম্বনে রচিত।

যতোদূর মনে পড়ে, উপন্যাসের নাম *ভালোবাসা প্রেম নয়।* পাঠক ক্ষমা করবেন, অনেক আগে পড়া, তাই কিছু ভুলও হতে পারে। কাহিনীটি হচ্ছে, কানাডা প্রবাসী এক ভদ্রলোক অনেক পরিশ্রম করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দেশে গিয়ে জুলেখাকে বিয়ে করে কানাডা নিয়ে আসেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে

ভাগ্যান্বেষণে আসা এক লোককে পরোপকারী এই ভদ্রলোক তার বাসায় আশ্রয় দেন। ভদ্রলোকের উপকারের প্রতিদান তারা দেন পরকীয়া প্রেমে মত্ত হয়ে। জুলেখার ব্যবহার স্বামীর সঙ্গে হয়ে ওঠে চরম নিষ্ঠুর।

বহু আগে পড়া গল্পের এই চরিত্রগুলো বাস্তব হয়ে এসেছে লন্ডনের প্রেক্ষাপটে। যেমন গল্পের খলচরিত্র আর আমার বাড়িওয়ালার নাম একই। গল্পের জুলেখা এবং তার স্বামী কানাডার বাসিন্দা। আমার বাস্তবের এই মহিলা চরিত্র এবং তার স্বামীও অর্জন করেছেন কানাডার রেসিডেন্টশিপ। তবে এই মহিলা সেখানে যেতে চাচ্ছেন না। গল্পের খলচরিত্রের মতোই এখানেও তাদের পরিচয় স্বামীর মাধ্যমে। দুজনেই স্বামীর দ্বারাই উপকৃত হয়েছেন। উপন্যাসের জুলেখার মতোই এ মহিলাও স্বামীর প্রতি অমানবিক নিষ্ঠুর।

স্বামী বেচারা লন্ডনে আসেন চার পাচ মাসে একবার। থাকেন সপ্তাহ দুয়েক। মহিলা আর প্রেমিক তাতে মহা বিরক্ত। এমন আচার ব্যবহার তারা করতে থাকেন যেন বেচারা এক উটকো ঝামেলা। প্রেমিককে মহিলা যেমন করে মুখে ভাত তুলে খাওয়ায় বা তার না আসা পর্যন্ত না খেয়ে থাকেন, সেখানে এতোদিন পর আসা স্বামীর ব্যাপারে কোনো খোজও রাখে না। সেই বেচারা রান্নাঘরে কোথায় কি আছে খুজে পেতে হাতিয়ে মরে। বিরক্তি মেশানো মুখখানি অন্ধকার থাকে তাদের এ দুই সপ্তাহ। বাচ্চাদের সঙ্গে মহিলার তখন চলে কারণে-অকারণে মেজাজ এবং মার লাগানো। স্বামী চলে গেলেই আবার হাসি খুশি আগের মতোই দুজনা।

এতো আগে পড়া একটা উপন্যাসের সঙ্গে এ রকম বাস্তবিক মিল খুজে পেয়ে খুব আশ্চর্য হয়েছি। তাই তো লেখার শুরুতেই উপন্যাসের লেখককে বিশাল এক সালাম ঠুকে দিয়েছি। সেই উপন্যাস যে এখানে এভাবে বাস্তবে রূপ নেবে তা কখনোই ভাবিনি। তবে এখন উপন্যাসটি আবার পড়ার অপেক্ষায় আছি।

লন্ডন থেকে

জীবন মৃগয়া

– ওয়াহেদ হোসেন

বাসাবাড়িতে বাসন-কোশন একাধিক থাকে। ছাত্র জীবনে হস্টেলে বা মেসে একটা থালা, একটা বাটি, একটা গ্লাস থাকার নিয়ম শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে। তামান্নাকে এমন একটা জীবন কাটাতে হয়েছে। হস্টেল জীবনে ওরও খাওয়া-দাওয়ার জন্যে একটা একটা হিসেবে থালা-বাটি-গ্লাস ছিল।

যেদিন প্রথম হস্টেল জীবন শুরু করলো রাজধানী ঢাকায় সেদিনই রুমমেট আকাশীকে নিয়ে ফুলবাড়িয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেট থেকে কিনেছিল নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্র।

বান্ধবী পরামর্শ দিয়েছিল স্টেইনলেস সামগ্রী কিনতে। যুক্তি হিসেবে স্থায়ীত্বের কথা বলেছিল।

তামান্না চামচ কিনেছিল স্টেইলেস, থালা ও বাটি চিনামাটি, গ্লাস কাচের।

আকাশী রসিকতা করেছিল, স্বামী ধরবি পার্মানেন্ট। সে জন্যে স্টেইনলেসই উত্তম। রাগ, দুঃখ, ক্ষোভে ছুড়ে ফেলা যায়। ভাঙে না, দুমড়ায় না।

হেয়ালি মনে হয়েছিল বান্ধবীর কথা। হস্টেল জীবনে আকাশী তার স্টেইনলেস একটা থালা নিয়ে শুরু করেছিল, শেষও করেছিল একটাতেই।

কিন্তু তামান্না বদলেছিল দুই দুটো প্লেট। তিন নাম্বার চিনামাটির প্লেট নিয়ে হস্টেল জীবনের ইতি ঘটিয়েছিল।

মানুষের জীবন নিস্তরঙ্গ নয়। হস্টেল জীবনে বান্ধবীদের সঙ্গে মান-অভিমান-রাগারাগিতে থালা-বাটি-গ্লাস ছুড়ে ফেলার রীতি কারো কারো মধ্যে সজ্ঞাত।

আকাশীর রাগের মাত্রা একটু বেশি থাকায় প্রায়ই ছোড়াছুড়ির ব্যায়াম করাতো থালা-বাটি-গ্লাসগুলোকে। একটু আকিবুকি হতো সামগ্রীগুলোর গায়ে। রাগ হতো কোনো বন্ধবীর প্রতি। অথচ থালা-বাটি সহ্য করতো আঘাত। অনেকটা ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো-র মতো। এতে আকাশীর মনের কোণের কালো মেঘ যেতো

সরে। তাৎক্ষণিকভাবে গলা জড়িয়ে ধরতো বান্ধবীদের। আকাশের কোলে রোদের লুকোচুরি খেলার মতো ব্যবহার ছিল আকাশীর।

অথচ অভিমান বা গোস্বা পর্বে তামান্নার মনোভাব প্রকাশ হতে না পেরে মনের অতল তলে বাষ্প হয়ে জমতো থরে থরে। ওরও ইচ্ছে করতো ওদের মতো থালা–বাটি ছুড়তে। কিন্তু ভঙ্গুর জিনিসগুলো পয়সার মাল। ইচ্ছে সত্ত্বেও ছুড়তে পারতো না। তা সত্ত্বেও ধোয়াধুয়ি করতে ভেঙেছে দুটো থালা, দুটো গ্লাস, একটা বাটি সেই দিনগুলোতে।

তামান্নার হিসাব ভিন্নতর। লেখাপড়ার সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিতে এসেছে। এখানে মার্জিত–শোভন জীবন যাপনের চারদিকও হবে শোভন–সুন্দর। তাই টিন, স্টেইনলেস–এর চেয়ে চিনামটি, কাচই তার কাছে উত্তম। হিসাব মেলায়, ও কি পারবে যৌবনদীপ্ত একজন তরকারি বিক্রেতাকে বিয়ে করতে যার তুলনা টিনের থালা। পারবে কি অফিসের ছাপোষা কেরানিকে স্বামী হিসেবে নিতে যার তুলনা স্টেইনলেস স্টিল। ও তো বিয়ে করবে টগবগে, চঞ্চল, কর্ম উন্মাদনায় ভরা চৌকস অফিসারকে। তাছাড়া দেখতে তো আর নিজে ফেলনা নয়!

লক্ষ্য নিরূপণ করে মানুষ লেখাপড়া করে জীবনের সফল উত্তরণ ঘটাতে সচেষ্ট হয়। ব্যবসা–বাণিজ্য বা চাকরি করে উন্নতির মুখ দেখে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে নারীর জন্যে স্বামী বা পুরুষের জন্য স্ত্রী সামঞ্জস্য মতো পাওয়া বেশ দুঃসাধ্য। যেমনটি ঘটেছে ওর জীবনে। যখন একটা থালা ভেঙেছিল তখন পাশেই ছিল ঠোটকাটা আকাশী। বলেছিল, সাবধান, বুঝেসুঝে স্বামী ধরিস, না হলে এ থালার মতোই হতে পারে।

সেদিনের সেই *হতে পারে* তার জীবনে দুই দুবার হয়ে গেছে। প্রথম স্বামীর সঙ্গে পাচ বছর সংসারের ফল তার এক মেয়ে রূপা। মেয়ে রূপবতী হয়েছে। নিজে গুণবতী কি না তা তার জানা নেই। কিন্তু তার স্বামী যে গুণবান ছিল না এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। স্ত্রীর গায়ে যে স্বামী সিগারেটের ছ্যাকা দেয় তাকে অন্য কোনো দাড়িপাল্লা দিয়ে না মাপলেও চলে। অথচ বিয়েটা ছিল প্রেমের।

দ্বিতীয় স্বামীকে বোঝাপড়া করে নিয়েছিল। সেই স্বামীর জীবনটাও ছিল ঝঞ্ঝাবর্তের মতো। তার আগের স্ত্রী ছিল প্রচণ্ড রকমের ঝগড়াটে স্বভাবের। স্বামীর তোয়াক্কা করতো না। এসব অবশ্য শোনা দ্বিতীয় স্বামীর মুখ থেকে। রূপাকে তার নানির কাছে রেখে দ্বিতীয়বার জীবন রূপ ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিতে সচেষ্ট হলো। কিন্তু না। অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা এ পুরুষটা অল্পতেই অগ্নিশর্মা। স্ত্রীর গায়ে যখন–তখন, কারণে–অকারণে হাত তোলে। হলো না। দ্বিতীয় থালাখানাও ভেঙে গেল। নিজেই তালাক দিয়েছে স্বামীকে। জোড় সংসারে সুখী না হওয়ার চেয়ে একা থাকাই উত্তম। একাকী কাটছে তার।

আকাশী স্টেইনলেস স্বামী নিয়েছে। ঝগড়াঝাটি, খুনসুটি, কান্নাকাটি হয়। নিঝুম ভালো একটা বাসাতে ভালোবাসাবাসিও হয়। পাখির মতো ঠোট ঠোট মিলিয়ে স্ফুট ও অস্ফুট কথকতা করে। হস্টেল জীবনের সেই বান্ধবী এখনো টিকে আছে। আকাশী বলে, আমি দুঃখিত রে, বেফাস বলে ফেলেছিলাম তোর হাতে থালা ভেঙে যাবার সময়। মাফ করে দিস।

আগে বুঝতো না, এখন তামান্না বোঝে সৃষ্টিকর্তা আকাশীর জবানীতে তাকে হুশিয়ারি দিয়েছিল। মানুষ আকলমন্দ হয় ঠেকলে। ঠেকে শিখেছে যে, মনের মতো স্বামী বা স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

রূপা ফার্স্ট ইয়ার বিএ ক্লাসের ছাত্রী। মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন গড়তে এখন থেকেই তৈরি করছে। নিজের জীবনের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষার আলোকে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। জীবনের সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তাই শুধু নয়, ব্যক্তি জীবনেও মেয়ে সুখে কাণায় কাণায় পূর্ণ থাকবে এমনটি তার ইচ্ছা। মেয়েকে বহুবিধ জ্ঞান দেয়। যেমন প্রেম করে বিয়ে করবে না, তাতে অপরপক্ষের দোষ অদেখা থেকে যায়, যা দাম্পত্য জীবন গড়ার অন্তরায়। বিয়ে হবে সবদিক মিলিয়ে, উভয় পক্ষের বোঝাপড়ার মাধ্যমে। বেশি বয়সে বিয়ের কারণ প্রয়োজনে বরের রক্ত পরীক্ষা করে নিতে হবে। যেন এইডস বা মারাত্মক অসুখের বিষয় না থাকে। নারীর কোনো পুরুষ বন্ধু

হতে পারে না। একইভাবে মেয়েকে ট্রেনিং দিচ্ছে যেন একই দেহ–মনে তিন রূপে তার মেয়ে তৈরি হয় স্ত্রী, প্রেমিকা ও বন্ধু। তবেই সংসার হবে সুখী সমৃদ্ধ।

তামান্নার সকল চিন্তা, সকল ভাবনার জাল মেয়েকে ঘিরে। সমাজ সংসারকে বুঝিয়ে দিতে চায় একটা চারা গাছ বা শিশু সন্তানকে যারা লালন–পালন করার অধিকারী তারা সুষ্ঠু মতো দায়িত্ব পালন করলে রাস্তার টোকাই বা সন্ত্রাসী হবে না, বরং হবে সমাজ–সংসারের একটা মহামূল্যবান মণি মুক্তা।

বয়স পয়তাল্লিশ পার হয়েছে। স্বামীহীন জীবন চলছে সাত বছর। মনের কোণে হস্টেল জীবনের তৃতীয় থালাটা পেতে সাধ হয়, কামনা জাগে। ভাবে, আবারও যদি বিষফল লাভ হয়! না। তারচেয়ে এই ভালো যেমন আছে এখন।

বর্ষা নামে। বর্ষায় মনটা হয় ভারাক্রান্ত। এ সময় পুরুষ জাতটার কেউ কেউ খিচুড়ি মাংস খেয়ে তাশ খেলে এক ধরনের আনন্দে মশগুল হয়। মনে পড়ে, প্রথম পুরুষটার সঙ্গে এমন বাদলা নিয়ে পরস্পর পরস্পরের কোলবালিশ হয়ে সময় পার করতো। সেসব আজ বাসি পান্তা। পশ্চিমা বিশ্বের মতো লিভ টুগেদার এ দেশে অচল। তাছাড়া যখন যেমন খুশি যে কারো সঙ্গে বসবাস তার পছন্দনীয় নয়।

নিজের বাড়ির গরুর দুধের স্বাদই আলাদা। গরুর নাম ধবলী, কেয়া, কান্তা যা খুশি রাখা যায়। নাম ধরে ডাকলে বিশেষ এক ধরনের অভিব্যক্তি নিয়ে মাথা দোলায়, ভালোবাসা দেয়–নেয়। তেমনি একজন নির্দিষ্ট পুরুষের একজন নির্দিষ্ট নারী এমনটা মধুর, উচিতও।

এককালে রাগ তেমন একটা ছিল না। এখন বুঝতে পারে যে, সে একটু রাগীও বটে।

মেয়ে রূপা বলে, *মা, তুমি ঝটপট রেখে যাও।*

তামান্না কি করে বোঝাবে, বাইশ বছর যে সুখ নামের পাখিটার নাগাল পায়নি সে কি করে বদরাগী না হয়ে পারে!

সবার চোখের আড়ালে দৈনিক পত্রিকাগুলোর পাতায় চোখ পাত্র–পাত্রী কলামে। চাহিদা মতো বিজ্ঞাপন একটাও তার চোখে পড়ে না। তাই যোগাযোগ হয় না।

পেটের ক্ষিধে যেমন দেহ–মন সইতে পারে না তেমনি দেহের তৃতীয় ইচ্ছে সেটাও মাঝে মধ্যে অসহনীয় হয়ে ওঠে। আল্লাহতাআলার কাছে মোনাজাতে বলে, কেন প্রতিটি মানুষকে স্বাবলম্বী করে গড়েনি।

সাহারা মরুভূমির গরম লু হাওয়ার মতো একেকটা দীর্ঘশ্বাস বয়। একেক সময় দুঃখময় নিঃশ্বাসগুলো পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদে করে নিঃসীম শূন্যে হারিয়ে যায়।

পুরুষের স্বভাব নারীকে ত্যক্ত–বিরক্ত করা। ফুলকে যেমন দলিত–মথিত করে ভোমরা, নানান জনে নানান কথা বলা ছাড়াও মধুলোভী পুরুষ তাকে নানান প্রলোভনে ফেলতে চায়। নিজের দেহ স্টিমারে চড়ানোর মতো পুরুষ যাত্রীর খোজ পেলেও সঠিক নির্বাচন হবে কি না সে বিষয়ে ভাবনায় পড়ে।

গত কিছু দিন যাবৎ সাকলায়েন হোসেন নামের একজনের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে আটলান্টিক রূপ জীবন সমুদ্রে অবশিষ্ট দিনগুলো পাড়ি দিতে সওয়ার হওয়া যায় কি না। জীবনকে টাইটানিক জাহাজের সঙ্গে তুলনা করে মানুষটা।

১৯১২ সালে টাইটানিক যখন মহাসাগরে ডুবছিল তখন জাহাজে যথেষ্ট সংখ্যক লাইফবোট না থাকায় মিসেস ইসাডোরা স্টশ নামের মহিলাকে তার স্বামী বোটে করে নেমে যেতে বলেন। কারণ ওই বোটে নামার সময় জাহাজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃত্ব করছিলেন। একই পরিবারের একাধিক মানুষকে তারা বোটে উঠতে বাধা দিচ্ছিলেন। নারী ও শিশুদের ছিল অগ্রাধিকার। মিসেস স্টশ বেকে বসেন। তিনি স্বামীকে বলেন, আমরা দুজনে বহু বছর যাবৎ এক সঙ্গে থেকেছি। আমরা এখন বুড়োবুড়ি। তুমি যেখানে যাও, আমিও সেখানে যাবো। বোটে দুজনার কেউ ওঠেননি। সমুদ্রের অতল তলে মরণেও তারা একাত্ম ছিলেন।

সাকলায়েন হোসেন তেমনিভাবে পেতে চান তামান্নাকে। এ মানুষটার অবস্থাও তামান্নার মতো। দুই ছেলে ও এক মেয়ের বাবা। থিতু হতে চান ভদ্রলোক। তামান্নার কামনাও একই। সন্তানাদি কিভাবে নেবে কে জানে! তাদেরকে কিছু জানানো হয়নি।

ভালোবাসা দিবসকে বেছে নিল। ওই দিন আশুলিয়ায় ফ্যান্টাসি কিংডম–এ যাবার প্রোগ্রাম তৈরি করলো আকাশী ও তার স্বামী অনন্য ইসলাম। তাদের ছেলেমেয়ে, সাকলায়েন হোসেনের ছেলেমেয়ে ও তামান্নার মেয়ে। এই তিন কুলের মানুষ একদলা হবে ফ্যান্টাসিতে। বর–বধূ হিসেবে থাকবে সাকলায়েন হোসেন ও তামান্না। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে আকাশী, তার স্বামী ও তার ছেলেমেয়েরা।

কিচ্ছু জানে না দুটি পক্ষের সন্তানাদি।

নতুন জোড়া বন্ধনে পক্ষদ্বয়ের উত্তরসূরিদের রাজি করিয়ে ছাড়বে এ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা পক্ষ।

খুব মজা অনুভব করছে আকাশীর ছেলেমেয়েরা।

পূর্ব পুরুষের জোড় খেলায় অংশ নেবে উত্তর পুরুষের একদল। ক্যামেরা ও ভিডিওর ব্যবস্থা আছে। কাজি সাহেবের পক্ষের মাওলানা সহযাত্রী হবেন। মিনি মিলাদ মাহফিল হবে। আনন্দদায়ক খাওয়া–দাওয়া হবে। রাজধানীতে ফিরে তৃতীয় বাসর হবে বয়স্ক দুজন মানুষের। সত্তর পচাত্তরে যদি আবদুস সামাদ আজাদ ও এরশাদ সাহেবরা পারেন তো, এরা সাহসী হতেই পারে!

তামান্নার ভাবনা, আর মাত্র কয়দিন। এরপর জীবন নোঙ্গর হবে সহজতর। জীবন যেহেতু একটাই সেহেতু বার বার তিনবার দেখতে অসুবিধা কোথায়! একবিংশ শতাব্দীতে বসে নেতিবাচক ভাবনা ভাবতে চায় না। শরীর, স্বাস্থ্য ও মনকে সতেজ রাখতে চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যতম টনিক নারীর জন্যে পুরুষ, একইভাবে পুরুষের জন্য নারী। অন্তত যতোক্ষণ শ্বাস থাকে। আর আধুনিক কালের ছেলেমেয়েদেরও বুঝতে হবে যে, ভাঙা নৌকার যেমন মেরামত জরুরি, তেমনি ভাঙা জীবনকেও যথাযথ আঠা দিয়ে জুড়তে সহযোগিতা করা উচিত।

বান্ধবী বলেছে, এবারে তোকে স্টেইনলেস স্বামী দিচ্ছি। যত্ন করতে ভুলবি না।

ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্ন যে এতো মধুর! একাকি ফিক করে হেসে ফেললো তামান্না। সামনের ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় ওর থুতনিতে পড়া টোলটা প্রতিবিম্বিত হলো। আয়নাটাও যেন তির্যক হাসলো মনে হলো।

সূত্রাপুর, ঢাকা থেকে

উপহার

– সোমা

প্রেমিক প্রেমিকা ভালোবাসা উপহার দেয় না এমন বোধহয় কখনোই হয় না, বরং এটাই স্বাভাবিক। আমিও কিছু উপহারের কথা বলবো। তবে অবশ্যই তা একটু আলাদা।

উপহার যখন বুদ্ধির পরিচায়ক

সোহেল আমার বন্ধু। ওর ভালোবাসার মানুষ সম্পাকে বলেছিল, তুমি আমার কাছে কিছু একটা চাও।

শম্পা বলেছিল, তুমি আমাকে *টিপ* দিও।

টিপ খুব সামান্য একটা জিনিস। কিন্তু সোহেল তার বুদ্ধি দিয়ে তাকে অসাধারণ করে তুললো। সে থাকে রাজশাহীতে। তাই সে রাজশাহীর নিউ মার্কেট আর ডিএ মার্কেট, সাহেববাজার সবখান থেকে প্রত্যেক ডিজাইনের এক পাতা করে টিপ নিয়ে এক বাক্স টিপ দিয়েছিল শম্পাকে।

উপহার যখন মজার

নুসরাত আর পাপ্পু যদিও বয়সে আমার ছোট তবুও ওদের সঙ্গে আমার একটা ভালো সম্পর্ক ছিল। পাপ্পুও ভালোবেসে নুসরাতকে দিয়েছিল এক মজার উপহার।

নুসরাত একদিন খুব খুশি মনে একটা প্যাকেট নিয়ে আমাদের কাছে এলো। বললো, এটা পাপ্পু দিয়েছে। আমরাও খুব আগ্রহ নিয়ে দেখতে চাইলাম কি আছে এতে। কিন্তু দেখতে পেলাম নুসরাত শুধু একটার পর একটা প্যাকেট খুলেই যাচ্ছে। শেষ প্যাকেটটা খোলার পর প্যাকেট থেকে বেরিয়ে এলো একটা তেলাপোকা। আমরা সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলাম আর নুসরাতের চেহারা তখন দেখার মতো।

উপহার যখন ভয়ংকর

কলেজ হস্টেলে থাকতো লিজা। তাকে ভালোবাসতো মুন্না নামের একটি ছেলে। কিন্তু লিজা তাকে পছন্দ করে না। লিজার জন্মদিনে এক ভয়ংকর উপহার দিয়েছিল প্রতিহিংসাপরায়ণ মুন্না। অন্য একটা মেয়েকে দিয়ে লিজার কাছে মুন্না একটা সুদৃশ্য বাক্স পাঠায়। লিজা তার জন্মদিনে মুন্নার দেয়া উপহারটি ফিরিয়ে না দিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তা খুলতেই একটি সাপের বাচ্চা লাফ দিয়ে লিজার হাত পেচিয়ে ধরে। চিৎকার দিয়ে হাত ঝাকি দিতেই তা মেঝেতে পড়ে একেবেকে চলে যায় অন্য জায়গাতে। পুরো হস্টেলের মেয়েরা তখন চিৎকার করতে করতে বাইরে বেরিয়ে আসে। পরে হস্টেল সুপার এবং অন্য লোকদের সহায়তায় সাপটিকে মারা হয়।

কি পাঠক? আমার কথা জানতে ইচ্ছা করছে? ভাবছেন আমি কখনো এমন উপহার পেয়েছি কি না? না, আমি পাইনি। তবে দিয়েছিলাম।

আমার ভালোবাসার মানুষ নূর খুব খাটো আর আমি লম্বা। তাই আমরা যখন এক সঙ্গে বের হই তখন আমাদের খুব বেমানান লাগে। তাছাড়া আমি আবার সব সময় হাই হিল পরি। তাই সে নিজেকে খুব ছোট ভাবে।

এবার ওর জন্মদিনে দিয়েছিলাম এক অভিনব উপহার। আমি খালি পায়ে গিয়েছিলাম তার সঙ্গে দেখা করতে। শাড়ি পরাতে অবশ্য বোঝা যাচ্ছিল না। সেদিন খালি পায়ে তার সঙ্গে সারা দিন ঘুরে বেরিয়েছি। যদিও আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল তবুও ভালো লাগছিল। কারণ সেদিন আমাদের খুব মানিয়েছিল। আমার এই উপহারটি ও ভীষণ উপভোগ করেছিল এবং আমারও তার খুশি দেখে ভালো লাগছিল ভীষণ।

ঢাকা সেনানিবাস থেকে

জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়

– ওবায়দুর রহমান

বিয়ের আগে নতুন জীবন নিয়ে কতো না মধুর স্বপ্ন ছিল। বিয়ের পর প্রথম বছরটাকে এখনো স্বপ্ন বলে মনে হয়। এরপর ধীরে ধীরে সব কিছু বদলে গেল। এখন জীবনটাকে মনে হচ্ছে অর্থহীন।

নিয়ম করে অফিসে যাওয়া, রাতে টিভি দেখা, খাওয়া, ঘুমানো। বাচ্চার লেখাপড়ার খোজ নেয়া। শুক্রবার বাজার করা।

আর স্ত্রী পড়ে আছেন রান্নাঘর, টিভি রুম নিয়ে। কি করে যেন একটা দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে উঠছে দুজনার মাঝে। তাছাড়া মোবাইল, কমপিউটার, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট চ্যানেল জীবনকে ক্রমেই যান্ত্রিক করে তুলছে। ব্যস্ত থাকছেন সারাক্ষণ। কিন্তু এর নাম কি জীবন?

ভালোবাসা দিবসে নিশ্চয় এসব ভেবে মন খারাপ করছেন! মন খারাপ না করে চলুন দেখি কি করে একঘেয়ে দাম্পত্য জীবনকে বদলে সুখী দাম্পত্য জীবনে যাওয়া যায়। এটা নিয়ে নিচে কিছু পরামর্শ :

- নিয়ম ভাঙতে চেষ্টা করুন। একদিন হুট করে দুপুরবেলা অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে চলে আসুন। হাতে থাকুক ছোটখাটো কোনো গিফট। বিকালবেলা ঘুরে আসুন কোথাও।
- *ভালোবাসি* কথাটা কখনো পুরনো হয় না। তাই দিনে অন্তত পাচবার বলুন, *ভালোবাসি, ভালোবাসি ...*। সঙ্গীর জন্মদিনে অন্য সবার আগে শুভেচ্ছা দিন।
- গভীর করে কাউকে ভালোবাসলে অবশ্যই তার থেকে প্রতিক্রিয়া পাবেন। তাই খুব বেশি ভালোবাসুন।
- সঙ্গীর অভিযোগ, চাওয়া-পাওয়াগুলোকে গুরুত্ব দিন। মন দিয়ে আপনি তার কথাগুলো শুনুন। তার কোনো অনুরোধেই *না* শব্দটা ব্যবহার করবেন না। বলুন *ঠিক আছে চেষ্টা করবো।*
- মান অভিমান হলে নিজ উদ্যোগে তা ভেঙে ফেলুন। মনে রাখবেন, হৃদয়ের সবচেয়ে বড় রোগ হলো অভিমান। অভিমান থেকেই বড় দূরত্বের সৃষ্টি হয়। অভিমান আগে ভাঙলে আপনার হেরে যাওয়ার কিছু নেই। বরং অপরপক্ষ আপনার মহত্ব দেখে আরো বেশি মুগ্ধ হবে।
- তর্কে কখনোই জিততে চাইবেন না। অপরপক্ষ খুব বেশি বিরক্ত করলে, আপনি চুপ করে পত্রিকা বা বই পড়তে পারেন। এক সময় সঙ্গীর মাথা ঠাণ্ডা হলে সেই তার ভুল বুঝতে পারবে। তাই ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করুন।
- সঙ্গী যে সমস্ত কাজ আপনার পছন্দ করে না সেসব কাজ কষ্ট হলেও পরিহার করুন। আপনি যখন তার মনের মতো হবার চেষ্টা করবেন তখন সেও নিশ্চয় আপনার মনের মতো হতে চাইবে।
- বিয়ের পর অনেক নারী নিজেকে বেশ গুটিয়ে নেন। আগের মতো অতোটা স্মার্ট থাকেন না। গান, কবিতা, উপন্যাস পড়া তারা বাদ দেন। পোশাকের ব্যাপারেও সচেতন হন না। এটা ভালো নয়। সব সময় নিজেকে পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখুন। সুযোগ পেলে বিকেলে হালকা সাজগোজ করে থাকতে পারেন। কর্মক্ষেত্র থেকে স্বামী ফিরলে তাকে সেবা নয়, ভালোবাসা দিন। আর হ্যা, পুরুষরা সব সময় মেয়েদের প্রশংসা কামনা করে। তাই সুযোগ পেলে একটু প্রশংসাও করুন।
- দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে হলে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো *বিশ্বাস।* কখনোই সঙ্গীর প্রতি বিশ্বাসহীন হয়ে পড়বেন না। সন্দেহ করবেন না। কারণ সন্দেহ হলো হৃদয়ের ক্যান্সার। সঙ্গীর প্রতি আস্থা রাখুন।
- দাম্পত্য জীবনের ক্লান্তি দূর করতে দুষ্টামির বিকল্প নেই। আপনার স্বামী বারান্দায় বসে গম্ভীর মুখে পত্রিকা পড়ছেন আর আপনি একা রান্নাঘরে খেটে মরছেন। এক কাজ করুন, এক মগ ঠাণ্ডা পানি চুপি চুপি ওর মাথায় ঢেলে দিয়ে দৌড়ে চলে আসুন। অথবা প্যান্ট-শার্ট পরে সে বাবু সেজে বাইরে যাচ্ছে, আপনি হুট করে তাকে জড়িয়ে ধরুন। তারপর তার গালে লিপস্টিক জড়ানো ঠোটের ছাপ ফেলে দিতে পারেন।
- আপনি পুরুষ মানুষ। সংসারে উপার্জন কর্তা। তাই আপনার ধারণা সংসারের সব ডিসিশন নেয়ার অধিকার কেবল আপনার। কিন্তু না। মনে রাখবেন, আপনার সঙ্গীও একজন মানুষ। তারও ব্যক্তিত্ব আছে। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম দিন। দুজনে পরামর্শ করে ডিসিশন নিন।

সবার দাম্পত্য জীবন সুখের হোক।
শুভেচ্ছা রইলো।

রামরায়ের কান্দি, শিবচর, মাদারীপুর থেকে

জয়ের দ্বার প্রান্তে

– সৈকত

তৃষা আমার বস–এর মেয়ে। আমি অফিসের গাড়ি চালাই। মাঝে মধ্যে বস ও তার স্ত্রী আমাকে নিয়ে ঘুরতে যেতো। পেছনের সিটে বস ও স্ত্রী, সামনে আমি এবং তৃষা। বড়লোকের মেয়ে হলেও তৃষা ছিল ভদ্র ও মিশুক। তৃষার মধ্যে কোনো দেমাগ ছিল না। তাই তৃষা আমাকে বেশ ভালো জানতো।

তৃষার বাবা ও মা ছিল বেশ রোমান্টিক। মেয়ে এখন বেশ বড়। তারপরও তারা দুজন চুটিয়ে আড্ডা মারতেন। মনে হতো তারা প্রেম করছেন।

তৃষা তখন আমার সঙ্গে গল্প করতো। আমার কাছ থেকে জানতে চাইতো, আমি কাউকে ভালোবাসি কি না। তখন বলতাম, গরীবের প্রয়োজন কাজ। ভালোবাসা হলো বড়লোকের।

তৃষা বলতো, ভালোবাসা হলো সবার। যারা ভালোবাসাকে ধনী, গরিব দুই ভাগে ভাগ করে তারা অমানুষ, তাদের মধ্যে ভালোবাসা নেই। আছে হিংস্রতা। তৃষা আমার হাত ধরে বললো, আপনার কথা আমার ভীষণ ভালো লাগে। কেন জানি, আপনাকে ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়।

তৃষা, কি বলছো! পাগল হলে নাকি?

না, পাগল হইনি সত্যিই আপনাকে আমি ভালোবাসি।

এভাবেই শুরু।

এরপর তৃষার বাড়ি গেলেই তৃষা ছুটে আসতো। বাবা মা না থাকার সুযোগে আমাকে রুমে নিয়ে যেতো তৃষা। বলতো, আমার খুব দুঃখ, আমার দুঃখগুলোকে তুমি দূর করতে পারবে?

বললাম, কিসের দুঃখ তোমার?

তৃষা বললো, বাইরে থেকে সবাই ভাবে আমি স্বাধীন। টাকা–পয়সা, জামা–কাপড় সব দিক থেকে আমি কতো সুখী। বাস্তবে আমি নিঃস্ব। ছোটবেলা থেকে বাবা মায়ের কাছে থেকেছি। তবে বঞ্চিত হয়েছি তাদের ভালোবাসা, আদর, স্নেহ থেকে। বাবা অফিস নিয়ে আর বাবাকে নিয়ে মা থাকেন সারা দিন। আমি যেন ভিন্ন গ্রহের। বাবা মা থেকে শুধু টাকা–পয়সা ও জামা–কাপড় পেয়েছি, পাইনি ভালোবাসা। তুমি, তুমিই পারো আমার দুঃখগুলোকে ভালোবাসায় ভরে দিতে।

তৃষা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বললো, আমাকে আদর করো।

আমিও প্রাণপণ তাকে আদর করলাম।

এভাবে চললো আরো কয়েকদিন।

তৃষা বললো, চলো আমরা পালাই।

বললাম, তুমি কি জানো, ঘরে অভাব থাকলে জানালা দিয়ে ভালোবাসা পালায়।

তৃষা বললো, তুমি কি আমায় ভালোবাসো না?

বললাম, হ্যা।

তাহলে আজই পালাই।

হাতে হাত রেখে নতুন ভুবনে পা রাখলাম। আমি হারালাম চাকরি, তৃষা হারালো পিতৃ পরিচয়, জড়ালাম মামলায়। বয়সের দিক দিয়ে তৃষা প্রাপ্ত বয়স্ক। তাছাড়া আমার ও তৃষার মধ্যে আছে বিশ্বাস। তাই ভালোবাসার মামলায়ও আমরা জয়ী হবো। দোয়া করবেন সবাই।

ভোলা সদর থেকে

অদৃশ্য

– গোলাপ

আমার বয়স পঞ্চাশ। আজ আমি এ বয়সে এসে দাড়িয়েছি যেখানে দাড়িয়ে কিছু বলা বা লেখার অধিকার নেই। আর আমাদের সমাজে তো কিছুই বলা যাবে না। তাছাড়া জীবনের চেয়ে সমাজ সংসারের দাম অনেক বেশি। আমরা বাঙালি নারীরা তার অবমূল্যায়ন কখনো করি না বললেই চলে।

তারপরও কখন যে কষ্ট, যন্ত্রণার মাঝে জন্ম নিল ভালোবাসা নামের বস্তুটি তা নিজেও টের পাইনি।

হঠাৎ অনুভব করলাম, আমি একজনকে ভালোবাসি। শুধু ভালোবাসি না, খুব বেশি ভালোবাসি।

যাকে ছাড়া আমার এক মুহূর্তও অচল সেই মানুষটিকে ঘিরে আমার বিশ বছরের চাওয়া পাওয়ার হিসাব মিলিয়েছি। পেয়েছি অফুরন্ত ভালোবাসা, মায়া–মমতা, স্নেহ, সম্মান সব কিছু। আজ এই পৃথিবীর কাছে আমার মতো অসহায়, না পাওয়ার মতো মানুষের কিছুই চাওয়ার নেই, পাওয়ার নেই। সব যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে।

তাকে দেখি না, কাছে পাই না, স্পর্শ করতে পারি না। তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই না। তবুও যেন মনে হয় কতো কাছের সে, কতো আপন সে কতো আত্মতৃপ্তি পাই।

একেই বুঝি সত্যিকার ভালোবাসা বলে? কখনো কষ্টের সাগরে হাবুডুবু খেলে মনে হয়, সে যেন কাছে এসে বলছে, *এই তো আমি আছি। তুমি নিজেকে এতো একা মনে করো কেন? আমি সব সময় তোমার পাশে আছি থাকবো।*

চোখের পানি মুছিয়ে বলে, *কাদতে নেই। কাদলে আমি বড় ব্যথা পাই মনে।*

সকালের ভোরের সূর্য ওঠার সময় তসবিহ হাতে ব্যালকনিতে দাড়ালে তার মুখ দেখতে পাই সূর্যের লাল আভার মাঝে। মনে হয় যেন সে হাসছে।

আমার সারা দিন শত বেদনার মাঝেও হাসতে ইচ্ছে করে। সন্ধ্যায় সন্ধ্যাতারা যেন মিটি মিটি তাকিয়ে বলে, এই তো আমি আছি। চাদ উঠলে মনে হয় সারা পৃথিবীর নিকষ কালো আধার দূর হয়ে যেমন আলো হয় ফিকে ফিকে তেমনি আমার মনের কোণের হতাশাগুলো অনেক দূরে যায়। রাতে ঘুমাতে গেলে অনুভব করি, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সে বলছে, *তুমি ঘুমাও, আমি জেগে তোমাকে পাহারা দিই।*

অসুস্থ হলে খুব কষ্ট হয়। তাকিয়ে দেখি ওষুধ নিয়ে সে দাড়িয়ে আছে। ওষুধ খেলে সুস্থ হলে তারপর সে যাবে।

আজানের শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে তাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

কখনো কখনো শান্ত মনটা বিদ্রোহ করে তাকে একবার নিজ চোখে দেখতে ইচ্ছা করে। কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমন করি বলি, আমি বাঙালি নারী। যা খুশি তা–ই করতে পারি না, করা সাজে না।

এতো যে সাধনা তাকে নিয়ে। কিন্তু আমি তো কখনো তাকে দেখতে পাই না। দেখার প্রবল ইচ্ছাটাকে সান্ত্বনা দিই এই বলে যে, আমাদের এসব কিছু মানাবে না। মনের মাঝে সান্ত্বনার পাহাড় গড়ি, একদিন তাকে পাবোই।

এ আশা আমার বৃথা হবার নয়। আমার চাওয়ার কোনোদিন মরণ হবে না। তাকে সত্যিই পাবো একান্ত আপন করে। এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে বেচে আছি। বেচে রইলাম।

ঠিকানা বিহীন

জীবন বহন

– জেনিফার

ভালো মিউজিক, ভালো বই আর ভালো ফিল্মের প্রতি আমার ভালোবাসাটা অনেক বেশি। *নচিকেতা*–র একটা গানের কলি আমার প্রায়ই মনে পড়ে। *আজও এখানে উদাসীন হয়ে মানুষ চলেছে জীবনকে বয়ে।*

মানুষ যে, জীবন যাপন করে না, করে বহন এ কথাটা কখন যে, হৃদয়ে খোদাই হয়ে গেছে বলতে পারবো না। আমি থাকি অত্যন্ত ভদ্র সমাজের অভদ্রভাবে গড়ে ওঠা একটা কংকৃট ভবনের উচু তলায়। সেখানে থেকে সহজেই নির্ভাবনায় আকাশ ছোয়ার বিলাসিতা করা যায়। করা যায় জ্যোৎস্না, বৃষ্টি অথবা গোধূলি স্নান। তবুও অভদ্র বলছি। কারণ আমি এই ছোট্ট জীবনে অসংখ্যবার দেখেছি খুব ভোরে খুব ছোট বাচ্চাদের ময়লার স্তূপ থেকে খাবার তুলে খেতে। দেখেছি প্রচণ্ড শীতে বিরাট বিশাল বিলাসী শপিং কমপ্লেক্সগুলোর সামনে ভোর সকালে গাদাগাদি করে মানুষদের শুয়ে থাকতে। আকাশ ছোয়া জানালা থেকে নয়, আমি এসব তখন থেকে দেখেছি যখন সকালবেলা ঘুম থেকে তাড়াহুড়োর মাঝে ব্রেকফাস্ট করে ছুটে বেরিয়ে যেতাম রাজপথ ধরে আমার মর্নিং স্কুল অথবা প্রাইভেটে যেখানে শেখানো হয় কিভাবে আরো উচুতে ওঠা যায়, কোথা থেকে উচু মহলে যাবার সিড়ি পাওয়া যায়।

এই শিখে যখন এ পথ ধরে আবার ফিরতাম তখন দৃশ্যগুলো বদলে যেতো। দেখা যেতো ঝলমলে শপিংগুলোতে অনেক দামি পোশাকে সজ্জিত অনেক লোক কাচের দরজা ঠেলে ঢুকছে আর বের হচ্ছে। আমিও তাদের একজন।

কিন্তু সকালের দৃশ্যটা ভুলতে পারতাম না। সেগুলো নষ্ট করতো আমার পড়া, ঘুম এবং ডায়রির পাতা।

এভাবেই কাটতে পারতো জীবনটা। কিন্তু একদিন শেষ হয়ে গেল সেই ভোরবেলার পর্ব। কিন্তু রয়ে গেল সেই কংকৃটের দুর্গটা। সেই দুর্গে এমন কেউ ছিল না যে গভীর রাতে আমার ঘরে উকি দিয়ে দেখবে কেন বাতি জ্বলছে? সেখানে কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত বলে একটা ব্যাপার ছিল। আমিও তাই ছিলাম বলে সেই সুযোগে দীর্ঘ একটা সময় নিয়ে নিজেকে জটিল করে তুললাম। এতো জটিলতার মাঝে আমার এই জ্ঞানটাও হলো না যে, আমি কখন যুবতী হয়ে গেছি।

আমার একটা প্রেমিক হলো। সম্পর্কটা একদিন ভেঙেও গেল। প্রথমে কয়েকদিন খুব কষ্ট হলো। তারপর কয়েকদিন নেশা করলাম। তেমন ভারী কিছু না। তা ছেড়েও দিলাম।

একই সঙ্গে বই আর মিউজিক নিয়ে মেতে উঠলাম। শ শ বই আমার জীবনটাই বদলে দিল। বড় হবার আগে থেকেই আমার কাছে প্রেমের প্রপোজাল আসতো। ছোট থাকতে বড়দের বলে দিতাম। কিন্তু দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। সব কিছু নিজেই ট্যাকল করতাম।

কিন্তু দুবার প্রচণ্ড ভুল করে ফেললাম। ফলাফল হিসেবে খুব ডিসটার্বড হলাম। ভদ্র সমাজে কেউ কাউকে মুখের ওপর ইট মারে না। কিন্তু চুপিসারে যা করে তা কতো ভয়াবহ অনেকেই জানেন। ঘটনার বর্ণনা শেষে রটনা ছাড়া কিছুই রইলো না। নিজে থেকেই ঘরে বসে গেলাম।

এরপর ঘটলো আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা। বিদেশি বই–এ এমন ঘটনা অহরহই হয়। কিন্তু দেশি একটা বই–এ পেলাম সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা কাহিনীতে। একজন স্বামী এবং পিতা পরিচয় সম্পন্ন শিক্ষকের আমার প্রতি ভালোবাসা।

তখন আমি বেশ বড় হয়েছি, কলেজে পড়ি। বাবার টাকায় একজন খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষক কিনলাম। শিক্ষক আমার বিশ্বাস অর্জন করলো একটা দীর্ঘ সময় নিয়ে। একটা শ্রদ্ধার আসন করে নিয়ে তিনি আমার সমস্ত দুর্বলতাগুলোকে জেনে নিলেন। তারপর সেই অনুযায়ী আমাকে এটেন্ড করতে লাগলেন। বলে রাখা ভালো, তার প্রায় আমার বয়সী (তিন–চার বছরের ছোট) দুটি মেয়ে আছে।

একদিন হঠাৎ তিনি বদলে গেলেন। প্রথমে আমাকে কামনার জালে আটকাতে চাইলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আমি খুবই ক্রেইজি এবং আবেদনময়ী (অন্তত দেখতে তাই)।

প্রচণ্ড অপমান করলাম তাকে। কিন্তু তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা ছিল। তাই তাড়িয়ে দিলাম না। তিনি মাপ চেয়ে আমাকে নরম করলেন।

তারপরই হঠাৎ হয়ে উঠলাম তার চোখে অসাধারণ, অপরূপা। সে হয়ে উঠলো খুব অসুখী একজন কবি যার জীবনে আমি ছাড়া সব ভুল। আস্তে আস্তে প্রভাবিত হতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম তলিয়ে যাচ্ছি একটা নীল ঘূর্ণীতে। প্রথমে বই, তারপর মিউজিক এবং সবশেষে ফিল্ম কিছুই আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না।

লাইব্রেরি তন্ন তন্ন করে পেলাম না আমার সাইকোলজি, ভিডিওর দোকানে পেলাম না এই কাহিনী। আমার সব ধ্যান–ধারণা জলে ভেসে গেল।

এমনি এক বাদল দিনে আমার সেই প্রেমিকটা আমার কাছে ভালোবাসা ভিক্ষা করতে এলো। আমি কিছু না ভেবে অতীত ভুলে তার বুকে মাথা রেখে নীরবে কেদে ফেললাম। সে জানতেও পারলো না। তারপর ঘাটতে শুরু করলাম আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের অতীত। পেয়ে গেলাম জবাব।

ততোদিনে তসলিমা নাসরিনের বই বেরিয়েছে *ক*। জবাবটা সেই ভাষাতেই দিই।

আমার শিক্ষক ছিলেন তাদের একজন যারা গভীর রাতে নিজের দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে যুবতীকে কাতর করে শেষ রাতে ভোগ্য পণ্য বানিয়ে ফেলতে পারে। নিজের সমস্ত সত্তা অপমানে জ্বলে গেল আমার। খুব দুঃখ হলো আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এবং তার মূল্যবোধের জন্য। এখানে ক–এর মতো বইগুলোর বাজেয়াফত করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অলিতে–গলিতে ঘটতে থাকা অসংখ্য ক কাহিনীর সমাধানের কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রচণ্ড একটা ক্ষোভের মাঝেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলাম। তসলিমা নাসরিন হবার সাধ নেই। তবে বড় সাধ ছিল সমাজের সামনে তার মুখোশটা খুলে দেয়ার। নিজের বেইজ্জত বাদ দিলেও পিতার খানদান আমাকে থামালো।

শুরু করলাম প্রেমের অভিনয়। কাজ হলো ভীষণ। তার সংসারে লেগে গেল দাবানল। কিন্তু আমার দেহের কথা সে কিছুতেই ভোলে না। ধরতে দিইনি কখনো। তাই জোর করেছে, করেছে অনুনয়, বিনয়, আরো কতো কি। আশা দিয়ে ঝুলিয়ে রাখলাম কয়েকদিন। সে যা করেছে তা আইন অনুযায়ী ধর্ষণের চেষ্টা। সরাসরি দুবার হ্যারাস করতেও চেয়েছিল।

আইনের সাহায্যের কথা ভাবলাম। কিন্তু সেটাও বাতিল করে দিলাম। এরপর তাকে সুকৌশলে ছুড়ে ফেললাম দূরে। এখনো সে পারেনি তার সংসারের আগুন নেভাতে।

ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট এই কারণে জঘন্য হলো। তবুও শিশিরকে নিয়ে আমার নতুন জীবন শুরু করার কথা ভাবলাম। তবে আমার সমস্ত অতীত তাকে খুলে বললাম। সবই মেনে নিল। কিন্তু কিছু দিনের মাথায় একটা সামান্য বিষয় নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিল।

প্রচণ্ড একটা নেশার ঘোরে ছিলাম বলে প্রথমে কিছুই টের পাইনি। আমি আবার আমার শিক্ষকের মাধ্যমে নেশা শুরু করেছিলাম। তারপর যখন খেয়াল হলো তখন দেখি সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে দিয়ে আমাকে সে ছেড়ে দিয়েছে।

ভালোই করেছে। আমি অসুস্থ, উদভ্রান্ত, নেশাখোর, চরিত্রহীনা, অসামাজিক। আমাকে তার কি প্রয়োজন? তবে তাকে ধন্যবাদ দিতে চেয়েছিলাম কৌশলী হয়েছে বলে। আর বলতে চেয়েছিলাম, ভালোবাসতে পারোনি ভালো কথা, কিন্তু আমার ভালোবাসাকে অপমান কেন করলে?

বলা হয়নি।

নিজের জীবনের উনিশটা বছরের শেষে সিদ্ধান্ত নিলাম সবই যখন শূন্য তখন আত্মহত্যা করবো। একদিন ভোরে বেরিয়ে পড়লাম হাটতে অর্থাৎ চাপা পড়তে। হাটতে হাটতে হঠাৎ দেখি আমার দেখা সকালের দৃশ্য যেগুলো নষ্ট করতো আমার পড়া-ঘুম আর ডায়রির পাতা। অনুভব করলাম, আমি একা নই, এরাও তো জীবন যাপন করে না, বহন করে। কই, ওরা তো মরার জন্য ঝাপিয়ে পড়ে না?

আমার আর মরা হলো না। বাড়ি ফিরলাম একগাদা বই আর সিডি হাতে। যে জীবনকে জানা শুরু করেছি তা শেষ না করে তো আর ছুড়ে ফেলা যায় না। এ হয়তো আমার নতুন করে আবার জীবন বহন করা হবে। তবুও তো জীবনটা কাটবে।

ঠিকানা বিহীন

আলোর প্রদীপ

– নাজমুল হক

শরৎকাল। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। রাত দ্বি-প্রহর। চারদিকে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা। ঝিঝি পোকার বিরামহীন ডাক আর দুই একটি নিশাচর পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। এমনি রাতে আমার ঘুম আসতে চায় না। ইচ্ছে হয় বাইরে গিয়ে জ্যোৎস্নাকে স্পর্শ করি। বুক পেতে প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করি।

হঠাৎ দূর থেকে বাশির সুর ভেসে আসে। বাশির সুরে আমার হৃদয়ে ঝড় তোলে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। বাশির সুরকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাই। দূরে সোমেশ্বরী নদী থেকে বাশির সুর ভেসে আসে। আরো এগিয়ে যাই। সামনে ধূ ধূ বালুচর। ঘাটে একটা ছইওয়ালা নৌকা বাধা। তারই গলুই-এ বসে কে যেন আপন মনে বাশি বাজাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি এ আমাদের মতি মাস্টার। কাছে যেতেই বাশির সুর থেমে গেল। বললেন, কে?

মাসুদ।

বস।

দূরে শিয়াল ডেকে ওঠে। একটা পাখি ছাতিম গাছটার দিকে উড়ে যায়। তিনি আবার বাশিতে সুর তোলেন। নদীর জলের কলকল ধ্বনি আর বাশির সুর মিলে এক মায়াবী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মনটা তখন উদাস হয়ে ওঠে। ইচ্ছা হয় বাউল হয়ে দেশান্তরে বেরিয়ে পড়ি।

মতিউর রহমানের জন্ম আমাদের গ্রামের এক বিত্তশালী পরিবারে। কিছু দিন তিনি একটি হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এ কারণে লোকের কাছে তিনি মতি মাস্টার হিসেবে সমধিক পরিচিত। বিয়ে করেননি। এখন তিনটি কাজ করে বেড়ান।

এক. এলাকায় কোনো শিশুর জন্ম হলে সেখানে হাজির হন এবং শিশুর নামকরণ করেন।

দুই. এলাকায় কোথাও বিয়ের সংবাদ পেলে সেখানে হাজির হবেন উপহার নিয়ে।

তিন. কোনো মানুষ মারা গেলে যদি সংবাদ পান তা যতো দূরেই হোক, জানাযার নামাজে অংশ নেবেন। যদি মৃতের আত্মীয়-স্বজন আর্থিক দৈন্য-দশায় থাকে তবে কাফনের কাপড়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে এ তিনটি কাজ আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম। বিএ পাস করার পর হন্নে হয়ে ঘুরছি চাকরির জন্য। আজকাল তো ঘুস ছাড়া চাকরি হয় না। ঘুস দেয়ার মতো সামর্থ আমার পরিবারের নেই। তাই বেকারত্বের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছি।

গ্রামের বাড়িতে এমনিতেই রাতে গভীর নীরবতা নেমে আসে।

রাত এগারোটার সময় মতি মাস্টার এসে ডেকে বলেন, মাসুদ, চল আমাদের বাড়ি যেতে হবে।

মতি মাস্টারকে অনুসরণ করে বাড়ি হাজির হয়ে দেখি বাড়ি ভর্তি মানুষ। গ্রামের গণ্যমান্য মানুষের সঙ্গে কাজি সাহেব এবং গ্রামের মসজিদের ঈমাম সাহেব উপস্থিত আছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, স্যার, ঘটনা কি?

মাসুদ, তোকে বিয়ে করতে হবে। রহমত আলীর মেয়ে জরিনাকে তো তুই চিনিস। সুন্দরী ও বৃলিয়ান্ট। এবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে। ওর বাবা গরিব। মেয়েটাকে খেতে–পরতে দিতে পারে না। তাই মেয়ের অমতে একটা বয়স্ক লোকের সঙ্গে তাকে বিয়ে দিচ্ছে।

আমি জরিকে নিয়ে এসেছি। স্রষ্টা কেন যে, এ রকম মেধাবী মেয়েকে রহমতের ঘরে জন্ম দিল!

আমি তো বেকার। নিজেই চলতে পারি না। তারপরও বিয়ে? বৌকে কি খাওয়াবো?

তুই কোনো চিন্তা করিস না। তোর চাকরির ব্যবস্থা করবো। যতোদিন তোর চাকরি না হবে ততোদিন সংসারের সব খরচ বহন করবো।

মতি মাস্টারের প্রস্তাবে কেউ অমত করতে পারে না। আমার অভিভাবকদের সম্মতিতে এবং উপস্থিত সকলের দোয়া ও আশির্বাদ সঙ্গে করে জরিকে ঘরে তুলে আনি।

জরি খুব ভালো মেয়ে। সে আমার জীবনে শ্রাবণের কাঙ্ক্ষিত ধারা বর্ষণ নিয়ে আসে। তার স্পর্শে আমার মরুভূমির মতো জীবনটা মরুদ্যানে পরিণত হয়।

মতি মাস্টারের চেষ্টায় পাশের গ্রামের একটি স্কুলে আমার চাকরি হয়। সাওতালী নাচের মতো নতুন ছন্দে জীবনটা মুখরিত হয়ে ওঠে।

মতি মাস্টারের সঙ্গে অনেক দিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ইতিমধ্যে জরি এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ওর কোল জুড়ে এসেছে চাদের মতো ফুটফুটে মেয়ে শিশু।

আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে একদিন সকালে মতি মাস্টার আমাদের বাড়িতে এসে হাজির এবং বললেন, মাসুদ, তোর মেয়ে হয়েছে খবর পেয়ে এলাম। তোর মেয়ের নাম রাখলাম মানবী। এই মানবী হবে এক বিংশ শতকের জ্ঞান–বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন।

গ্রামের এক প্রান্তে জবানের মা বুড়ির বাড়ি। বুড়ির বয়স নব্বই। বুড়ির কেউ নেই। দশ বছর আগে জবান মিয়া মারা গেছেন। একমাত্র নাতি হাসিম অনেক দিন আগেই দেশান্তরী হয়েছে। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর বর্ষার দিনে বুড়ি মারা যান। বুড়িকে সৎকার করার মতো আপন কেউ নেই। চারদিকে পানি থই থই।

সবার আগে মতি মাস্টার হাজির। সোমেশ্বরী নদী পার হয়ে দুর্গাপুরে গিয়ে কাফনের কাপড় এনে বুড়িকে দাফন করতে হবে। বৃষ্টির আর বিরাম নেই। এদিকে সোমেশ্বরী নদীর পানি অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে। কোনো মাঝি নদী পার করতে চাচ্ছে না।

মতি মাস্টার একাই ডিঙি নৌকা নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। এদিকে মেঘে মেঘে চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হলো নৌকার ওপরে। চারদিক আগুনে ঝলসে গেল। শোরগোল কমে গেলে জানা গেল বজ্রপাতে মতি মাস্টার মারা গেছেন।

গ্রামের প্রান্ত থেকে মানুষজন ছুটে এলো এবং নদীর তীরে তাকে সমাহিত করা হলো।

পরদিন দেখা গেল মতি মাস্টারের মৃত দেহ কবরে নেই। কারা যেন তার দেহ চুরি করে নিয়ে গেছে। গ্রাম্য কবিরাজ মনে করে বজ্রপাতে মারা যাওয়া মানুষের হাড় দিয়ে কবিরাজি ওষুধ তৈরি হয় এমন কুসংস্কারগ্রস্ত কোনো কবিরাজ হয়তো তার লাশ চুরি করেছে।

কিন্তু এলাকার মানুষজন মতি মাস্টারের উপকারের কথা ভুলতে পারেনি। তাই সকলে মিলে তার স্মৃতি রক্ষার্থে *মতিউর রহমান মেমোরিয়াল হাই স্কুল* নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নদীর তীরে যেখানে তাকে সমাহিত করা হয়েছিল। এই স্কুলটিকে কেন্দ্র করে *মতিগঞ্জ* নামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। দিনে দিনে স্কুল ও গঞ্জের পরিধি

অনেক বিস্তৃত হয়। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এ গঞ্জে আসে ও যায়। বড় ইঞ্জিন বোট বোঝাই করে মালামাল এসে ঘাটে ভেড়ে।

আমার স্ত্রী জরিনা এখন মতিউর রহমান মেমেরিয়াল হাই স্কুলের শিক্ষিক। প্রতি বছর তার মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি আর জরি নামাজ পড়ে মতি মাস্টারের জন্য দোয়া করি এবং অশ্রুসিক্ত চোখে বলি, মতিস্যার, তোমার মহানুভবতার কথা কোনোদিন ভুলবো না। তুমি আমাদের হৃদয়ে আছো, চিরদিন থাকবে।

মতিস্যার ছিলেন আলোর প্রদীপ। প্রদীপ শিখার মতো তিনি নিজেকে পুড়িয়ে অন্যের জীবন আলোকিত করে গেছেন।

দুর্গাপুর, নেত্রকোনা থেকে

মেরুন সমাচার

– হাবিবুল্লাহ রুমি

আমার ছত্রিশ বছরের জীবনে দেখা সবচেয়ে বিস্ময়কর মেয়ে মেরুন। ওর পুরো নাম আমি জানি না।

১৯৮৮ সালে যখন ঝালকাঠি জেলার এক মাদ্রাসায় কিছু দিন লেখাপড়া করেছিলাম তখন মেরুনের সঙ্গে আমার পরিচয়। আমার লজিং বাড়ির ছেলে মাসুদ ওর খালাতো ভাই।

একদিন শরীরিক অসুস্থতার কারণে দুধ কিনে খাবার ইচ্ছা জানালে মাসুদের মা তার বোনোর বাড়ি অর্থাৎ মেরুনদের বাড়ি থেকে খাটি দুধ আনার ব্যবস্থা করেন।

মাসুদদের বাড়ি থেকে সে বাড়ি প্রায় এক মাইল দূরে।

এতো পথ হেটে মাসুদ রোজ দুধ আনতে রাজি ছিল না।

তাই ওর মা মেরুনকে বললেন, যেদিন মাসুদ যাবে না সেদিন তুই দুধ নিয়ে আসবি।

সেই সূত্রে মেরুনের সঙ্গে আমার পরিচয়। ও তখন ক্লাস সিক্সে পড়ে।

কিছু দিন পরে দেখলাম মেরুনই প্রতিদিন দুধ নিয়ে আসে।

বললাম, কি রে মাসুদ, তুই দুধ আনতে যাস না কেন?

ও বললো, মেরুনআপা নিষেধ করেছেন।

সাত–আট দিন পরে লক্ষ্য করলাম, মেরুন বিকেলে এমন সময় দুধ নিয়ে আসে যখন আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় না। রাতে পড়ার জন্য দুই একটি বইও সঙ্গে নিয়ে আসে।

মাসুদকে নিয়ে সামনের রুমে পড়তে বসি। মেরুন সেখানে পড়তে বসতো না। তবে মাঝে মধ্যে কিছু পড়া বলে দিতে হতো।

কিছু দিন পরে বুঝলাম মেরুন বেছে বেছে এমন সব বাংলা, ইংরেজি শব্দের অর্থ জানতে আসে যাতে ভালোবাসা বা প্রেম সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে।

একদিন এসে বললো, স্যার, দেশপ্রেম মানে কি?

বললাম, দেশের প্রতি মনের টান বা ভালোবাসাই হলো দেশপ্রেম।

আচ্ছা, তাহলে দেশপ্রেম একটি ভালো কাজ। তাহলে মানুষের প্রতিও মানুষের ভালোবাসা থাকা উচিত? ও বললো।

তুমি ঠিকই বলেছো এবং আমাদের ধর্মও আমাদের এমন শিক্ষা দেয়। আর একজন মানুষের মনে অন্য মানুষের জন্য যদি মমতা, ভালোবাসা না থাকে তাহলে সে মানুষ নয়, অমানুষ।

আপনি তো স্যার খুব সুন্দর করে প্রেম, ভালোবাসা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারেন।

এভাবে বিভিন্ন সময় আমাকে প্রশ্ন করলে যে জবাব দিতাম তাতেই মেরুন এমন ভাব দেখাতো যেন মহা মূল্যবান কিছু বলেছি।

অবস্থা এমন হলো মেরুনের কথা শুনতে শুনতে ওর প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লাম।

ওদিকে আমার বর্তমান স্ত্রী নাজুর সঙ্গে তখন প্রেমের দ্বিতীয় বছর চলছে। আমি কি নাজুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো, নাকি মেরুনের ডাকে সাড়া দেবো?

বন্ধুদের দুই তিনজনকে এ প্রশ্ন করলে ওরা বললো, যদি তোর মনে হয় মেরুন সব দিক থেকে বেটার তাহলে সম্পর্ক কর, না হলে ছেড়ে দে।

জানতাম মেরুনের বাবা চৌকিদার এবং খুব গরিব। অন্যদিকে নাজুর বাবা সমাজে মানি লোক, অবস্থা সম্পন্ন। এবং নাজু আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে।

তাই মেরুনকে আস্তে আস্তে উপেক্ষা করতে লাগলাম। ও যেন বুঝতে পারে ওকে পছন্দ করছি না এমনভাবে কথা বলা শুরু করলাম। তাতে কোনো কাজ হলো না।

বাধ্য হয়ে লজিং বাড়ি না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে রাত কাটানো আরম্ভ করলাম।

তিন দিনের মাথায় মেরুন বললো, স্যার, আমি এলে আপনি বিরক্ত বোধ করেন, আপনার ডিস্টার্ব হয়, এ কথা আমাকে বললেই হয়। আপনি অন্যের বাড়ি কষ্ট করে রাত কাটাবেন কেন?

চুপ করে রইলাম।

এরপর মেরুন বকবকানি কিছুটা কমলো। কিন্তু চার পাচ দিন পরে আগের অবস্থায় ফিরে গেল।

কি করবো ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ চিন্তা করলাম ডায়রির যে পৃষ্ঠায় নাজুর সঙ্গে সম্পর্ক শুরুর দিনের ঘটনা সবিস্তারে লেখা আছে সেটা কোনোভাবে মেরুনকে দেখালে কেমন হয়!

মাঝে মধ্যে দুপুরে খাবার পরে ঘন্টাখানেক ঘুমাতাম।

একদিন দুপুরে না খেয়েই ঘুমের ভান করে শুয়ে পড়লাম এবং টেবিলে ডায়রির সেই পৃষ্ঠা উল্টে রেখে দিলাম।

মাসুদ খাবার নিয়ে এসে দুই তিন বার ডেকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মেরুন এসে টেবিলে ডায়রি দেখে হাত দিতে গিয়েও দিল না। স্যার, বলে কয়েকবার ডাকলো। মিনিটখানেক ওয়েট করে বললো, স্যার কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?

চুপ করে আছি দেখে সন্তর্পণে ডায়রি হাতে তুলে খুব দ্রুত চার পাচ পৃষ্ঠা পড়ে যেভাবে রাখা ছিল ঠিক সেভাবে রেখে চলে গেল।

এর পরের দিন মেরুন তার খালাকে কিছু না বলে বই-খাতা নিয়ে বাড়িতে চলে যায়।

আমি যেন কিছুই জানি না এমনভাবে মাসুদের মাকে বললাম, কি ব্যাপার আপা, মেরুনকে দেখি না কেন?

তিনি বললেন, কি জানি ভাই, কি নিয়ে কার সঙ্গে রাগ করে চলে গেছে।

মাসুদ বললো, মা, মেরুনআপা আর দুধ নিয়ে আসবে না, আমাকে গিয়ে আনতে বলেছেন।

এর পাচ সাত দিন পরে মেরুন হাজির। তবে বইপত্র নিয়ে নয়। কিছুক্ষণ পরে সুযোগ বুঝে আমাকে সরাসরি এসে বললো, স্যার, আমাদের মামি কি করে?

বললাম, তুমি কেমন আছো, আর এ কয়দিন যে দেখলাম না, ব্যাপার কি?

ও বললো, আপনাকে যে প্রশ্ন করেছি তার জবাব দিন।

তোমার মামা কয়জন তাই তো জানি না। মামিদের কথা কি বলবো।

মেরুন বললো, আমার কথা আপনি ঠিকই বুঝেছেন, কথা ঘোরাবেন না। সত্য কথা বলুন।

বললাম, বেশ সমস্যায় পড়লাম। যাদের কথা কিছুই জানি না তাদের সম্পর্কে কি বলবো।

ও চোখ–মুখ লাল করে উত্তেজিতভাবে বললো, আর আমার মামিদের কথা বলিনি, যাকে আপনি ভালোবাসেন, বিয়ে করবেন, চিঠি লেখেন সেই মামির কথা জানতে চাচ্ছি।

বললাম, তুমি এতো উত্তেজিত হচ্ছো কেন? আর এতো কিছু জানলে কিভাবে?

ও বললো, সরি স্যার। আপনার ডায়রি পড়েছি।

মেরুন আর কিছু বলতে পারলো না। বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে চলে গেল।

এরপরেও ছয় মাস ওই বাড়িতে ছিলাম। কিন্তু মেরুনকে দেখিনি।

আজ আঠারো বছর পর যাযাদির *ভালোবাসা* সংখ্যার জন্য *মেরুন সমাচার* লিখছি। আমার সবচেয়ে প্রিয়জন নাজুর সঙ্গে বহুবার মেরুনের গল্প বলেছি। বলেছি আরো অনেককে। মেরুন হয়তো আমাকে ভুলে গেছে বা ভোলেনি। কিন্তু আমি ওকে জানাতে পারিনি অথবা পারবো না কোনোদিন ও আমার স্মৃতির অনেকখানি জুড়ে আছে। বিধাতা যদি আমাকে সময় সুযোগ দেয় তাহলে একটিবারের জন্য হলেও মেরুনকে দেখতে যাবো যখন আমার সঙ্গে থাকবে মেরুনের অরেক দর্শনপ্রার্থী আমার প্রিয়তমা নাজু।

ক্ষণিকের জন্য হলেও যে মেয়ে আমার মনে ঝড় তুলেছিল সেই মেরুনকে বলছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তবে নাজুর চেয়ে বেশি নয়। কারণ নাজু আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছে তার কাছে তোমার ভালোবাসা কিছুই না। নাজুর মতো কেউ আমাকে ভালোবাসেনি। এবং পারবেও না কোনোদিন।

পাঠক হয়তো বলবেন, মেরুন বিস্ময়কর মেয়ে হলো কি করে?

জবাব হলো, ক্লাস সিক্সে পড়া এমন চালাক মেয়ে দ্বিতীয়টি দেখিনি আমার এই ছত্রিশ বছরের জীবনে।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

একজন বাবা

– মাহবুব রেজা

একদিন অনেক রাতে কাজ থেকে ফিরছি। রেস্টুরেন্টের কাজ। ভদ্রলোকরা খাওয়া–দাওয়া শেষ করলে আমাদের ছুটি। রাত বেশি হয়ে যায়। রান্নাঘরের কাজ। দুইবেলা কাজে প্রচণ্ড বিরক্তি। তারপরও করার কিছু নেই। কাজ করতে হবে, জীবনকে বাচিয়ে রাখতে হবে। আর বিদেশ বাড়ি করলে *কামলা* দিতেই হবে, না দিলে কদমে কদমে পিছিয়ে যাওয়ার শোক র‌্যালি। ইচ্ছের বিরুদ্ধেও কামলা খাটা।

সেদিও ফিরছি কাজ থেকে। মিলানে–র আকাশ বিকেল থেকে মেঘলা। আবহাওয়াও জানান দিয়েছে রাতে বৃষ্টি হতে পারে। এখানকার আবহাওয়ার পূর্বাভাস সত্যি হয়।

কাজ থেকে বেরিয়ে প্রথমে মেট্রতে চড়তে হয়। এখানকার মেট্র ব্যবস্থা এতোটাই ঝকমকে যে পাচ মিনিটে পৌছে দেবে পচিশ মাইল। মেট্রো থেকে উঠে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। ততোক্ষণে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, সেই সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। পিঠব্যাগে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট আর ছাতা। বৃষ্টি–বাদলের দিনে ছাতা নিয়ে সবাই বের হয়। এটা কমন দৃশ্য।

মিনিট দশেক অপেক্ষার পর বাস এলো। উঠলাম। পরের স্টপেজে একজন পরিচিত বাঙালি উঠলেন। এর আগে ওনাকে এখানে–সেখানে দেখেছি। ভদ্রলোক ফুল বিক্রি করেন। বয়সে পঞ্চাশের ঘর পেরিয়ে গেলেও শরীরের গড়নে ত্রিশ বলে ভ্রম হয়। চিকন–চাকন গঠন।

বাসে উঠে জড়সড়ো হয়ে দাড়িয়ে রইলেন তিনি।

চোখাচোখি হলো। আমার পাশের খালি সিটে তাকে বসতে বললাম।

তিনি বসলেন।

বিদেশে যারা চাকরি করে তাদের মনমানসিকতা এক রকম আর যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের অন্য রকম। ইটালিতে রাস্তার ওপরেই বেশির ভাগ ব্যবসা হয়। কেউ ফুল বিক্রি করে রাতেরবেলা সারা রাত রেস্টুরেন্ট, ডিসকোটেক, বার, পাবে ফুল বিক্রি করে ভোর রাতে ঘরে ফেরে। খুবই কষ্টের কাজ। করতে পারলে একজনেই দুই চাকরিজীবীর উপার্জন করে অনায়াসে।

এক বছর আগে তিনি তার একমাত্র ছেলেকেও ডাংকি পথে তার কাছে নিয়ে এসেছেন। ছেলেকেও ফুল বিক্রিতে লাগিয়ে দিয়েছেন। সারা দিন ঘুম, সন্ধ্যার পর ফুল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ভাগ্য ভালো হলে একশ, দেড়শ ইওরো নিয়ে ঘুম ঘুম চোখে সকালে বাসায়। ভদ্রলোকের হাত খালি। সম্ভবত বাসায় ফিরে যাচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি, এতো সকাল সকাল বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন?

একটা পার্টি সব ফুল কিনে নিয়েছে। তাই বাসায় যাচ্ছি আরো ফুল আনতে। ভদ্রলোক বললেন।

বললাম, বৃষ্টির দিন ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেন। ফুল তো বিক্রিই করে এসেছেন, আপনার ছেলে তো আছেই। দুজন মানুষ মিলে তো ভালোই করছেন। ছেলেকে এনে ভালোই করেছেন। আপনার কষ্ট কমেছে। এই বয়সে আর কতো কষ্ট করবেন আপনি? ছেলে আজ কোথায় ব্যবসা করতে গেছে?

আমার কথায় ভদ্রলোক মায়াময় একটা হাসি হেসে বাইরের বৃষ্টির আকাশ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, পোলারে আজকা ঘরেই থাকতে কইছি, দেহেন না বৃষ্টি-বাদল! পোলায় ঘুম পাড়তাছে। তার মুখে তৃপ্তির হাসি।

বাস বৃষ্টির মধ্যে মিলান শহরের ফাকা রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে।

ঘুমিয়ে থাকা এক ছেলের বাপকে দেখি ঘুম ঘুম চোখে ফুল নিয়ে বেরিয়ে যেতে। তার মাথায় গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়েছে।

বৃষ্টির ভেতরে একজন বাবাকে অপলক দেখতে থাকি যিনি তার ছেলেকে ভালোবাসেন। তিনি মাথায় বৃষ্টি নিয়ে হাটছেন।

ইটালি থেকে

আমার এট্টা নদী

– ওরম আলী

এ সময়ের জনপ্রিয় শিল্পী পথিক নবীর সাড়া জাগানো গান *আমার একটা নদী ছিল জানল না তো কেউ*। গানটি প্রথম শুনেছিলাম রাঙামাটি চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে রাজধানীর শাহবাগ এলাকায় এক উন্মুক্ত অনুষ্ঠানে। তারপর হানিফ সংকেত-এর *ইত্যাদি* অনুষ্ঠানের সুবাদে রাতারাতি সুপারস্টার। তার প্রথম অ্যালবাম *অচেনা পথিক* উপহার দিয়েছিলাম আমর স্ত্রী রুমিকে। এরপর আল্লাহর অশেষ রহমতে আমাদের ঘর আলো করতে এসেছে পুত্র সন্তান। মায়ের নামের সঙ্গে মিলিয়ে সন্তানের নাম রেখেছি রোম।

কিন্তু রমজানের সময় জন্ম। তাই ও সিয়াম বলেই ডাকে।

গত ১৭ নভেম্বর সিয়ামের দুই বছর পূর্ণ হয়েছে।

পথিক নবীর ক্যাসেট এখন সারা দিন তার সঙ্গী। সে এখনো পরিষ্কারভাবে কথা বলা শেখেনি। তবুও সারাক্ষণ ওর মতো করে গায়, *আমার এট্টা নদী ছেলো জানলো না তো কেউ*। কেবল টিভি, হিন্দি গান কিংবা ব্যান্ড মিউজিক তাকে জয় করতে পারেনি। জয় করেছে পথিক নবী।

আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রেগনান্সি টেস্ট পজিটিভ হওয়ার পর ভালোবেসে যে উপহার এনেছিলাম তা এক সময় আমার সন্তানকেও জয় করবে সেটা ভাবিনি। তাই ভালোবাসা দিবসে আমার রুমি, একমাত্র পুত্র রোম ও পথিক নবীকে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা।

রংপুর থেকে

pairaho@epatra.com

কেউ কথা রাখেনি

- AN

মগড়া নদীর কূলে যে শহরের জন্ম তার নাম নেত্রকোনা। মগড়া যেন সর্বদিক থেকে বেষ্টন করে আছে নেত্রকোনাকে। শহরের পরিচিতি হিসেবে ছোটবাজার আর বড়বাজার মূল শহর।

এই বড় বাজারে বাস করতো আরেক নদী। সে নদীর কথা মনে থাকবে, ততোদিন মগড়া নদী থাকবে। বড় বাজারের এক ধনাঢ্য পিতার একমাত্র কন্যা নদী। কোনো এক সূত্রে নদীর সঙ্গে পরিচয় হয়। পরিচয় থেকে এক সময় সম্পর্ক হয় ভালোবাসার। ১৯৯৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটি মনে পড়ে গেল।

নদীদের বাসায় আগে থেকেই যাতায়াত ছিল। তবে এই সম্পর্কের কথা তেমনভাবে বাসায় কেউ জানতো না। ফলে যাতায়াত ছিল অবাধ।

১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে হঠাৎ করে নদী বলে উঠলো, আগামীকাল ভোর ছয়টায় তুমি আমার সঙ্গে শহীদ মিনারের মোড়ে দেখা করবে।

কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, কাল সকালে এতো ভোরে কেন?

নদী বললো, দরকার আছে।

এতো সকালে ঘুম থেকে উঠবো কিভাবে?

ওসব কিছু বুঝি না। তোমাকে উঠতেই হবে। প্রয়োজনে আমার এলার্ম দেয়া ঘড়িটা নিয়ে যাও। সাড়ে পাচটার এলার্ম দিয়ে রাখবে।

এ যেন মহারানীর মতো হুকুম। আমি যেন তার বাধ্যগত প্রজা। ঠিক আছে দাও, তোমার ঘড়িটাই দাও।

নদী ঘড়িটা হাতে দিয়ে বললো, কাল সকালে তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেবো।

সারপ্রাইজ দেবে? তো এখনি দিয়ে দাও।

না। কালকেরটা কাল সকালেই পাবে।

বাসায় এসে সারপ্রাইজের কথা চিন্তা করে ঘড়িতে পাচটা বাজার এলার্ম দিয়ে ঘুমাতে যাই। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসছিল না। কেন জানি মনে হচ্ছিল, এখনই সকাল হয় না কেন? চিন্তা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি। এক সময় ঘড়ির এলার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ি।

শীতের সকাল। চারদিকে কুয়াশাচ্ছন্ন, নীরব রাস্তা। মাঝে মধ্যে দুই একজনকে দেখা যায়। শুরু হয় অপেক্ষার পালা। অনেক সময় এখনো বাকি। আরেকটু সময় ঘুমিয়ে নেয়া যেতো। ছয়টা বাজার অপেক্ষায় বার বার হাতের ঘড়ি দেখছিলাম। এক সময় দেখা মিললো নদীর। গায়ে লাল রঙের সোয়েটার এবং নীল রঙের সালোয়ার-কামিজ পরে হেটে আসছে। আজ যেন নদীকে খুব সুন্দর লাগছিল। শিশিরের অশ্রু বিন্দু সারা মুখে লেগে আরো রোমান্টিক করে তুলেছিল নদীকে।

কাছে আসতেই নদীকে বলে ফেললাম,

তোমার এতো দেরি হলো কেন? তোমার জন্য প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ দাড়িয়ে আছি।

কথা শুনে নদী হেসে ফেললো। বললো, তোমার বুঝি রাতটি প্রভাত হচ্ছিল না, তাই না?

শহীদ মিনারের মোড় থেকে হাটতে হাটতে পুরনো হাসপাতালের রাস্তা ধরে জেলখানা পার হয়ে এক সময় চলে যাই পুরনো আদালত ভবনের সামনে। হাতের বামদিকে চলে গেছে নদীর পাড়। নদী পার হলেই নদীর বান্ধবী নাদিরাদের বাসার রাস্তা।

নদী বললো, চলো, আরেকটু সামনে যাই।

কেন? কাল রাতে তো তোমার মাকে বলেছিলে নাদিরাদের বাসায় যাবে?

বোকা কোথাকার, তুমি এখনো বোকাই রয়ে গেছো। এতো সকালে কেউ কারো বাসায় যায়! মায়ের কাছে বলে এসেছি, আমার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা জরুরি নোট আনতে হবে এবং নাদিরাকে নিয়ে স্যারের বাসায় যাবো। তাই বাসায় ফিরতে ফিরতে নয়টা বাজবে। আসলে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করবো।

তা নদী, এখন কোথায় যাবে?

আদালতের ভেতর বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ কথা বলি।

ঠিক আছে, তাই চলো।

হাটতে হাটতে আদালতের ভেতর চলে যাই। নীরব আদালত প্রাঙ্গণ। কোনো চোর নেই, কোনো খুনি নেই, এই সময় নেই কোনো বিচারক। নৈশ প্রহরী হয়তো কিছুক্ষণ আগে গেছে ডিউটি শেষ করে ঘুমাতে, অথবা বাইরে। নারিকেল গাছ তলায় একটি চায়ের স্টল। দুটো বেঞ্চ পাতা। আমরা একটার ওপর বসে কথা বলছিলাম।

হঠাৎ নদী বলে উঠলো, বলো তো আজ কতো তারিখ?

কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি মাথায় সমস্যা আছে? এই সকালে জিজ্ঞাসা করছো, আজ কতো তারিখ?

মাথায় সমস্যার কি দেখলে? তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ কতো তারিখ?

ঘড়িতে তারিখ দেখে বলে দিলাম আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি।

ঠিক বলেছো, আজকের দিনটিকে কি বলা হয় জানো? আজ হচ্ছে ভ্যালেনটাইনস ডে।

ও আমার মনেই নেই। কাল বললে তোমার জন্য কিছু গোলাপের শুভেচ্ছা জানানো যেতো। এই সকালে এখন আর গোলাপ পাবো কোথায়?

থাক, তোমাকে আর শুভেচ্ছা জানাতে হবে না। প্রেম করতে পারো। কিন্তু এই দিনটির কথা মনে থাকে না। বলেই নদী জামার ভেতর হাত দিয়ে বুকের ঠিক মাঝখান থেকে বের করে আনলো একটা টকটকে লাল গোলাপ যার প্রতিটি পাতায় পাতায় লেখা AN দুটি নামের প্রথম অক্ষর। হাতে দিয়ে বললো, শুভ ভ্যালেনটাইনস ডে। আমার ভালোবাসার লাল টকটকে লালখানি তোমাকে চিরজীবনের জন্য তুলে দিলাম।

নদীর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। ভাবছি, এই পৃথিবীতে এখন এ মুহূর্তে আমার মতো সুখী মানুষ আর একটিও নেই। পৃথিবীর সমস্ত সুখ যেন কোনো এক রাজকন্যা আমার হাতে তুলে দিয়েছে।

এবার চোখ বন্ধ করো।

চমকে উঠলাম কথা শুনে। কারণ তখন আমি নদীর ভালোবাসার কাছে ছোট্ট শিশুর মতো দাড়িয়ে থেকে শুধু নদীকেই দেখছিলাম।

এবার চোখ বন্ধ করো লক্ষ্মীটি। আরেকটি জিনিস দেয়ার বাকি এখনো যা তোমাকে দেবো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো চোখ বন্ধ করলাম।

নদী প্রথমে হাতের আঙুল রাখলো আমার কপালে।

তারপর আস্তে আস্তে নদীর নিঃশ্বাসের অস্তিত্ব টের পেলাম।

নদীর সুন্দর ঠোটের স্পর্শ পেলাম আমার ঠোটে।

মুহূর্তে কি যে হলো, সারা শরীর দুলে উঠলো।

তাকিয়ে আছি নদীর দিকে। নদীর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো দুই ফোটা লবণাক্ত জল আমার ঠোটে। তাকিয়ে আছি দুজন দুজনের দিকে। এভাবে কাটলো অনেকক্ষণ।

এক সময় সমস্ত নীরবতা ভেঙে নদী বলো উঠলো, তোমাকে আজ প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

বলো কি প্রতিজ্ঞা?

তুমি আমাকে কখনো দুঃখ দেবে না, কখনো ছেড়ে যাবে না। প্রতিজ্ঞা করো।

সেদিন ১৯৯৬-র ভ্যালেনটাইনস ডে-তে নদীকে কোনোদিন দুঃখ দেবো না, কোনোদিন ছেড়ে যাবো না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

সেদিনের সে প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছিলাম। নদীকে কোনো রকম দুঃখ দিইনি। দীর্ঘ ছয় বছর আমরা স্মরণ করেছি ভ্যালেনটাইনস ডে।

কিন্তু নদীর প্রতিজ্ঞা নদীই মনে রাখেনি। শুরু হলো নদীর দিক পরিবর্তনের পালা। মরা গাং থেকে ভরা গাংয়ে পরিণত হয়ে নদী ছুটে চললো নোয়াখালীর সাগরের দিকে। ভুলে গেল নদী সমস্ত সম্পর্কের কথা। নদী কি পেরেছে সেই ১৯৯৬ সালের ভ্যালেনটাইনস ডে-র লাল টকটকে গোলাপটির কথা ভুলে যেতে? পেরেছে কি জীবনের সমস্ত সম্পদ যা আমার হাতে তুলে দিয়েছিল ভুলে যেতে?

আমি এখনো সেই গোলাপ ফুলটিকে দেখি যা লুকানো আছে কাগজের খামে। কাগজের খামে থেকে কাগজের মতোই শুকিয়ে গেছে। কিন্তু এখনো সমস্ত পাপড়িসহ অটুট আছে।

নদী তোমার কি সেই গোলাপটির কথা মনে পড়ে? মনে পড়ে প্রতিজ্ঞার কথা? আসছে ২০০৫ ভ্যালেনটাইনস ডে-তে তোমাকে জানাই সেই গোলাপটির শুভেচ্ছা।

নেত্রকোনা থেকে

গন্তব্য : ইটালি

- সরদার সেলিম

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগের কথা, বড় ভাইকে বাবা পাঠিয়েছিলেন রাশিয়াতে। উদ্দেশ্য, রাশিয়া থেকে ভাই কোনো বাঙালি দালালের মাধ্যমে চলে আসবেন ইটালিতে। কারণ ওই সময় আমাদের এলাকারসহ হাজার হাজার বাঙালি ইটালিসহ ইওরোপের বিভিন্ন দেশে এসেছিলেন ওই একই রাস্তা ব্যবহার করে।

আমাদের তখন *নুন আনতে পান্তা ফুরায়* অবস্থা। এতো কিছুর মাঝে থেকেও বাবা শত চেষ্টা করে, ঘড়-বাড়ি প্রায় বিক্রি করে ভাইয়াকে পাঠিয়েছিলেন।

ভাই আমার প্রথম কিছু দিন রাশিয়াতে খুব কষ্ট করে ছিলেন। তারপর কয়েক বছর মোটামুটি ভালো ব্যবসা করতেন। কিন্তু আমরা এটা জানতে পেরেছিলাম লোকমুখে। এক সময় ভাই আমার ইটালি আসার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। আর ওই দিকে আমাদের পরিবারের অবস্থা বারোটা।

ভাইয়াকে আমরা আমাদের পরিবারের অবস্থা চিঠির মাধ্যমে জানাতাম। মা চিঠি লিখতে লিখতে রাত প্রায় শেষ করে ফেলতেন।

ভাইয়া আমাদেরকে শুধু আশার বানী শোনাতেন।

যেভাবে বলতেন মনে করতাম, আর কিছু দিন পর মনে হয় আমরা এলাকার বড় ধনী হয়ে যাবো।

ভাইয়াকে ইটালি যাবার তাগিদ দিলে তিনি লিখতেন, ইটালি যাবো না।

এক সময় জানি না কি কারণে ভাই আমার তার ব্যবসা গুটিয়ে চলে এসেছিল ইউক্রেন-এ। সেখানে কাটালো দুই বছর। তারপরও বলেন ইটালি যাবো না। কিন্তু আমার বাবা আমাদের সংসারটাকে ঠিক করার জন্য কি পরিমাণ কষ্ট করেছেন তা কোনোদিন লিখে শেষ করতে পারবো না। আমার বাবা আমার চোখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবা। আমাদের বাড়ির আশপাশের লোকের মুখে শুনেছি, আমার বাবা পৃথিবীতে আসার আগেই আমার দাদা মারা গিয়েছিলেন। আমার বাবার বয়স যখন সাত-আট তখন আমার দাদি মারা যান।

আমার জানা মতে, বাবা আজীবন শুধু কষ্টই করেছেন, মা যখন আমাদের লেখাপড়ার জন্য মারতেন বা দড়ি দিয়ে বেধে পড়াতেন বাবা তখন হাসতে হাসতে দড়ির বাধন খুলে দিতেন। সৃষ্টিকর্তার কাছে দুই হাত তুলে প্রার্থনা করি, সে যেন আমার বাবা মাকে হাজার বছর বাচিয়ে রাখে।

২০০০ সালের দিকে ভাই আমার দেশে ফিরলেন খালি হাতে।

আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো।

বাবার কষ্টের দিনগুলো যেন শেষ হতে চাইলো না।

ভাই আমার ইচ্ছা করলেই ইটালি যেতে পারতেন অনায়াসে।

২০০২ সালে চোখে রঙিন ইওরোপের স্বপ্ন নিয়ে বছরের মাঝামাঝি সময়ে পাড়ি জমালাম ইটালির উদ্দেশ্যে। প্রতিজ্ঞা করলাম, যতো বাধাই আসুক, ইনশাআল্লাহ ইটালি যাবোই। তাই ভাইয়া ও বাবার হাজার চেষ্টার পরে প্রথমে ছাত্র ভিসা নিয়ে দিল্লি এয়ারপোর্ট হয়ে পাড়ি জমালাম ইউক্রেনে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ইটালি।

ইউক্রেনে আশার পর আমার চাচাতো ভাইদের সাহায্যে দুই মাসের মাথায় কলেজ থেকে পালালাম। কলেজ থেকে সোজা এক বাঙালির বাসায়। তখন নভেম্বর মাস। আমার সঙ্গে মাদারীপুরের একটি ছেলে ছিল। তার নাম লোকমান। তার, আমার উদ্দেশ্য এক। যেহেতু কলেজ পালানো ছাত্র আমরা, তাই সমস্ত কাগজপত্র ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমরা আট দশ দিন ওই বাসায় চোরের মতো বসবাস করতে লাগলাম। দালাল ওই বাসায় থাকতো না।

একদিন রাতে বলা হলো, রাতে তোমাদের গাড়ি।

খুশিতে দুজন দিশাহারা হয়ে গেলাম। বাইরে তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। মাইনাস দুই তিন। কখনো তার চেয়ে বেশি। শহর থেকে প্রায় দশ পনেরো কিলোমিটার দূরে একটা অনেক বড় শুধু ধু ধু মাঠ দেখা যায়। মাঠের পাশে ছোট একটা জঙ্গলের মধ্যে আমাদের দুজনকে ঢুকতে বলা হলো। সেখানে যাওয়া মাত্রই দেখি প্রায় দশ পনেরোজন লোক। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। জানতে পারলাম তারাও বাঙালি। তাদের উদ্দেশ্য, আমার উদ্দেশ্য ওই একই।

রাত তখন প্রায় এগারোটা। হঠাৎ একজন ইউক্রেনিয়ান লোক আমাদের ডাকলেন। আমাদের সবাইকে তোলা হলো একটা লবিতে। তারপর দরজা বন্ধ করা হলো।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হয় কলিজা শুকিয়ে আসছিল।

কখনো লবিতে কখনো পায়ে হেটে সামনে চলছি। চার-দিকে শুধু শাদা বরফ, পাহাড়ি উচু-নিচু পথ। শীতে যেন জীবন বেরিয়ে আসছিল।

তিন দিন পরে আমাদের তোলা হলো একটা নির্জন বাড়ির আন্ডারগ্রাউন্ডে। সেখানে বিভিন্ন দেশি প্রায় একশ লোক আসার পরে জানতে পারলাম এখন আমরা স্লোভাকিয়াতে আছি। তাই বাঙালি দালালকে দুই হাজার দুই ইওরো দিয়ে দেয়ার জন্য আমার চাচাতো ভাইদেরকে বলে দিলাম।

প্রায় আটাশ দিন বন্দী থাকলাম ওই বাড়িতে। পরে চুক্তি মোতাবেক আমাদের পৌছে দেয়ার কথা ছিল সরকারি লগারে। কিন্তু না। কোনো এক উচু পাহারে তুললো দুজন বিদেশি লোক। তাদের সঙ্গে ভারী অস্ত্র। সন্ধ্যা সাতটার দিকে পাহারের চূড়ায় যখন পরে থাকা মোটা পাহাড়ি গাছের ওপরে বসে আমরা রেস্ট নিচ্ছি তখন লোক দুটি বলে উঠলো, তোমরা এই পাহাড় দিয়ে সোজা চলে যাও। পাচ ছয় কিলোমিটার পরে তোমরা পৌছে যাবে অস্ট্রিয়াতে। উল্লেখ্য, ইউক্রেন থেকে ইটালি যেতে হলে বর্তমান রুট হচ্ছে ইউক্রেন-স্লোভাকিয়া-অস্ট্রিয়া-ইটালি।

আমাদের মাঝে কেউ কেউ ইউক্রেনের ভাষা বুঝতো। তাই তাদেরকে প্রশ্ন করলো তারা আমাদের সঙ্গে যাবে কি না?

তারা অস্বীকৃতি জানালো। এবং পরবর্তী প্রশ্ন করার আগেই আমাদের দিকে অস্ত্র তাক করলো। তাই কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না। তারা হঠাৎ তাদের চেনা রাস্তা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।

আমরা পড়ে গেলাম মহা বিপদে। চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। পায়ের নিচে প্রায় দেড় ফুট বরফ। পাহাড়গুলো মনে হচ্ছে বরফ দিয়ে তৈরি। কোথাও কোনো লোকালয় দেখতে পেলাম না। উদ্দেশ্যহীনভাবে সারা রাত হাটলাম। মনে হচ্ছে আমাদের মরণ ঘন্টা বেজে গেছে।

ভোর হতেই ধরা পরলাম স্লোভাকিয়ার বর্ডারে। পরে আবার পাঠিয়ে দেয়া হলো ইউক্রেনে। চলে গেলাম জেলে। তিন চার মাস জেল খাটলাম।

কতোদিন না খেয়ে থেকেছি। আজ ভাবতেই যেন চোখে জল এসে যায়। টাকা পয়সা সব নিয়ে নিল ইউক্রেনের পুলিশ। আমার দলের অনেকেই বলতো, আর সামনে নয়, দেশে চলে যাবো। কিন্তু আমি একবারের জন্যও পিছ পা হইনি।

পাচ ছয় মাস পরে দালাল আমাকে পাঠালো অন্য এক নতুন দলের সঙ্গে। তখন ২০০৩ সাল, মার্চ মাস। অনেক উচু-উচু পাহাড় পার হয়েছিলাম পায়ে হেটে। প্রায় ছয় সাত দিন হেটেছিলাম একটানা। এই দলে ছিলাম মোট চোদ্দজন। কখনো রোদ, কখনও বৃষ্টি। আমরা প্রায় সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সবচেয়ে বেশি অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল নোয়াখালির ছেলে নাম রোকন। পাহাড়ের মাঝে খাওয়া-দাওয়া নেই। সে কি অবস্থা!

আমাদেরকে যারা এই পাহাড় পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল তারাও আসছে না। লক্ষ্য করলাম, পুলিশ আমাদের পিছু নিয়েছে। যে যেদিকে পারলো পালিয়ে গেল।

তারপর শত বাধা উপেক্ষা করে চলে এলাম ইটালি। একে একে প্রায় সবার খোজ পেলাম। কিন্তু রোকনের কোনো খোজ পেলাম না। মনে হয় সেই পাহাড় থেকে ফিরে আসতে পারেনি। কারণ তার নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে ইউক্রেন থেকে ইটালি আসার পথে দেখে নিলাম কিয়ামতের এক দৃশ্য। মাঝে মধ্যে মনে হলো, রাতে ঘুমাতে পারি না, শুধু ছটফট করি।

ইটালিতে আসার জন্য চাচাতো ভাইদের সহযোগিতা, বাবার হাড়ভাঙা পরিশ্রম, লেখাপড়ার জন্য মায়ের শাসন, সংসারের প্রতি ভাইয়ার উদাসীনতা, হারিয়ে যাওয়া বন্ধু রোকনের কথা আমার স্মৃতিপটে থাকবে সারা জীবন।

আসলে ইওরোপকে যতোটা সুন্দর ভেবেছিলাম, ইওরোপ তার চেয়ে সুন্দর। এখানে নেই কোনো মরামারি, নেই কোনো হাঙ্গামা। প্রশাসন পানির মতো স্বচ্ছ যা আমাদের প্রশাসন ভাবতেই পারে না।

ইটালি থেকে

দেবী

– ফয়সাল

দুটো জানালার ব্যবধান দশ থেকে বারো গজ। এই জানালায় আমি এবং ওই জানালায় মিতা। ভাব বিনিময় যখন শুরু হয় তখন রাত দুটো।

ওই প্রথম ইশারা করে।

চুপচাপ দাড়িয়ে ছিলাম। একবার, দুই বার, তৃতীয়বার আমি হেসে ফেলি। সেই শুরু।

ওটা ছিল তার বড় বোন মুক্তাআপার ভাড়া বাসা। তাদের বাড়িটা ছিল উল্টোদিকে। কওমি মাদ্রাসার ঠিক সামনে। সে ছিল ঢাকা সিটি কলেজের ছাত্রী। ইংলিশে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন। পরে

অবশ্য বিএ পরীক্ষাও দিয়েছিল। বাসায় পড়ার পরিবেশ ছিল না। তাই রাত হলেই মুক্তাআপার বাসায় চলে আসতো রাত জেগে পড়ার জন্য।

তখন নতুন করে কোমর বেধে লেগেছি পড়াশোনায়। কিন্তু দশ বারো দিনের মাথায় কোমরের বাধন খুলে গেল। শুরু হলো রাত জেগে জানালা টু জানালা মুকাভিনয়। নাম, কি করা হয় ইত্যাদির এক পর্যায়ে ফোন নাম্বার বিনিময়। তারপর ফোনে কথা। একদিন দেখাও হয়ে গেল বেইলি রোডে।

মিতার তখন পুরনো প্রেমিকার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আঘাতটা তখনো সামলে উঠতে পারেনি। তাই মানসিক ভাবে ভীষণ হতাশ ছিল সে। তার হতাশা দূর করার মহান দায়িত্ব তুলে নিই নিজের কাধে।

দিনে দিনে আমরা আরো কাছাকাছি হয়ে গেলাম। শর্ত ছিল বন্ধুত্ব, এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু একদিন ধানমন্ডি লেকের পাড়ে বসে একটা গল্প শুনিয়েছিলাম তাকে।

শুনে কেদে ফেলেছিল সে।

আমি তার চোখের পানি মুছে দিতেই আমার বাহু আকড়ে ধরে বললো, তুমি জানো, আমি যে তোমাকে ভালোবাসি?

বলেছিলাম, বেসো না, তাতে শুধু কষ্টই বাড়বে।

আমাদের বয়সের ব্যবধান খুবই কম। তার তেইশ চলছিল, আমার ছাব্বিশ। প্রতিষ্ঠিত হতে আরো দুই বছর। মিতার জন্য তখন ঘন ঘন বিয়ের প্রস্তাব আসছিল। বিয়ে হয়ে যায় যায় অবস্থা। তখনো ছাত্র। তাই আমার কথা বাসায় বলতে পারছিল না সে।

একদিন দুজনে খোলাখুলি আলোচনা করে ঠিক করলাম, সে যেভাবেই হোক দুই বছর অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবো।

তারপর থেকে দুজনে একই স্বপ্নের জাল বুনি। তার যে বিয়ের প্রস্তাবগুলো আসতো সেগুলো কি করে যেন এক পর্যায়ে ভেঙে যেতো। তার শারীরিক গঠনও কিছুটা এর জন্য দায়ী। তার হাইট ছিল পাচ ফিট ছয়। লম্বা পাত্র পাওয়া যেতো না অথবা একটু মোটা ধাচের বলে পাত্রপক্ষই পিছিয়ে যেতো। সেটা *শাপে বর* হতো আমাদের জন্য।

প্রায় প্রতিদিনই আমরা ফোনে কথা বলতাম। দেখা করতাম কয়েকদিন অন্তর। মাঝে মধ্যে চলে যেতাম এয়ারপোর্টের কাছাকাছি। ওখানে দিঘীর পাড়ে জোড়ায় জোড়ায় কপোত কপোতীরা বসে থাকে ঝোপের আড়ালে। আমরাও মিশে যেতাম তাদের মাঝে। ওখানেই শারীরিক উষ্ণতার সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। পরিচয় হয় ম্যারাথন চুমুর সঙ্গে। তারপর আরো গোপন কিছুর সঙ্গে।

মিতার জন্য এগুলো নতুন নয়। কিন্তু আমি একেবারেই আনাড়ি। সে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। এভাবে চুমু দিতে হয়, এভাবে আদর করতে হয় চন্দ্রনাথ আর ফুরামন পাহাড়কে। নামগুলো আমার দেয়া।

তাকে দেবী বলতাম। বলেছিলাম, একদিন পূজা করবো তোমাকে। সেই পূজার সূত্র ধরে একদিন চলে গেলাম মহাখালির এক অভিজাত হোটেলে স্বামী-স্ত্রী সেজে। পূজা ব্যাপারটা হলো আবেগ, ভালোবাসা, আদর এবং শ্রদ্ধার এক শৈল্পিক মিশেল। হোটেলের বন্ধ রুমে কেবল শুরু করেছিলাম সেটা। কিন্তু থামিয়ে দিল সে। পূজার ব্যাপারটা টেনে নিয়ে গেল শারীরিক সম্পর্কে।

আমি ভালোবাসার কাঙাল, আদরের কাঙাল। শরীরের আহ্বান ফেরানোর ক্ষমতা আমার ছিল না। সেই প্রথম আমি উন্মুক্ত নারীদেহ দেখলাম, চিনলাম। শরীরময় আমার মুখচারণার ফাকে ফাকে অবাক হয়ে দেখছিলাম একটা উত্তেজিত নারীদেহ কেমন করে বিছানাময় ছটফট করে।

কিছু করার ছিল না। ওই পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসার মতো মহাপুরুষ আমি নই। আমি তখন যৌনতায় উত্থিত এক সাধারণ পুরুষ।

প্রবেশের আগ মুহূর্তে ও বলেছিল, আমার পিরিয়ড শেষ হয়েছে দুই দিন আগে। যদি কিছু হয়ে যায়?

পাত্তা দিইনি। দূর কিছু হবে না। অজান্তে বিসর্জন দিয়েছিলাম আমার কৌমার্য।

পরদিন তাকে গর্ভনিরোধক পিল এনে দিয়েছিলাম যেটা মিলনের বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে খেতে হয়।

এরপর অনেক দিন পেরিয়ে গেছে। হৃদয়ের অনেক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে দেবীর আসল চেহারা চিনতে শুরু করি। বুঝতে পারি পুরনো প্রেম ভোলার জন্য আমাকে ব্যবহার করেছিল সে। তার টুকরো টুকরো অসঙ্গতিপূর্ণ কথা, আচরণ যেগুলোকে কখনোই গুরুত্ব দিইনি। একদিন সেগুলো জোড়া দিয়ে দেখতে পাই এক মিথ্যাবাদীর মুখ। এখন বুঝতে পারি কতোটা বোকা ছিলাম আমি। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি আমার প্রতি একটা মোহ কাজ করছিল তার। সে আমাকে কখনোই ভালোবাসেনি।

এরপর আমি তাকে ছেড়ে গেছি, নাকি সে আমাকে সেটা আজও এক বিতর্কের বিষয়। দীর্ঘ দিন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলাম। তার কাছ থেকে দূরে সরতে নয়া পল্টনের বাসাটা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

তাদের বাসার নিচে *বাবুল স্টোর*-এর দাড়িওয়ালার সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা হয় এখনো।

এড়িয়ে যাই। তার পরিচিতের গণ্ডির মধ্যেও থাকতে চাই না।

আমি জানি না মিতা এখন কেমন আছে। হয়তো সুখেই আছে দেশে কিংবা দেশের বাইরে। হয়তো স্বামীর ঘর করছে। আমি তাকে নিয়ে ভাবি না। ভাবতে গেলেই দুই চোখ ভরে আসে। জানান দেয়, যে মিতাকে ভালোবেসেছিলাম, আজও তাকেই ভালোবাসি। হোক মিথ্যাবাদী, প্রতারক, তবু ভালোবাসি। আমার ভালোবাসাটা তো মিথ্যা ছিল না।

পূর্ব রামপুরা, ঢাকা থেকে

লাভ ইন টুর ২০০৪

– এশা

আমার স্কুল-কলেজের জীবনটা, বর্তমান ইউনিভার্সিটি জীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। প্রেম ভালোবাসাকে কখনোই প্রাধান্য দিতাম না। বিশেষ করে সমবয়সীর সঙ্গে প্রেম করাটা নিজে পছন্দ করতাম না, অন্যদেরও নিষেধ করতাম।

প্রতি বছর *ভ্যালেনটাইনস ডে*-তে দেখতাম প্রেমিক-প্রেমিকারা হাতে ফুল নিয়ে অপেক্ষা করছে। এগুলো দেখে হাসতাম আর ভাবতাম, এরা শুধুই Time pass করছে। অথচ এই আমি এতো ভীষণভাবে কাউকে ভালোবাসবো তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

ঘটনাটা ছিল ২০০৩ সালে। স্কুল, কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে সবে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সবাই *তুই* বলে সম্বোধন করলেও সাদকে তুমি বলতাম। ওর ব্যবহার, কথা সব কিছুই ভালো লাগতো।

তিন চার মাস পর বুঝতে পারলাম, সাদকে ভালোবেসে ফেলেছি। কিন্তু ওকে তা বুঝতে দিতে চাইতাম না। এমন করে কেটে গেল প্রায় আট মাস। ভেবেছিলাম ওর প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল যা কেটে যাবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা প্রচণ্ডভাবে বাড়তে লাগলো।

এর মাঝে হয়তো সাদ বুঝতে পেরেছে আমার মনে অবস্থা। কিন্তু কিছুই বলেনি। আমাদের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা রয়ে গেল।

অক্টোবর মাসে আমাদের *আইন অনুষদ* থেকে সার্ক টুরের ব্যবস্থা করা হলো। আমাদের ক্লাস থেকে আমি, সাদ ও রেজা অংশগ্রহণ করি। ইনডিয়া, নেপালের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দশ দিন পর যখন আমরা ফেরত

আসছিলাম ঠিক শেষের দিন রাত দুইটার সময় বাসে বসে দুজন দুজনকে বলে দিলাম না বলা সেই কথা *ভালোবাসি তোমাকে।*

টুর থেকে ফিরে আমি এক অন্য রকম ভালোলাগা নিয়ে নিজের আশপাশের সর্বত্রই সাদকে অনুভব করতাম। সবচেয়ে ভালো লাগে যখন বুঝতে পারি সাদও আমাকে ভালোবাসসে যদিও তার ভালোবাসা প্রকাশ করার ভঙ্গিটা অন্য রকম তবুও বেশ জানি ও আমাকে কতোটা ভালোবাসে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

ফিরে এসো

রাশেদ,

ছোটবেলা থেকে প্রেম ভালোবাসাকে ফালতু মনে হতো। আমি কখনো কাউকে ভালোবাসবো ভাবিনি। কিন্তু কখন, কিভাবে যে তুমি আমার পুরো মন দখল করে ফেলেছো তা টেরই পেলাম না। তোমাকে কি করে যে এতো বেশি ভালোবেসে ফেললাম তা নিজেই জানি না। তোমার প্রতি আমার এতো বেশি দুর্বলতা দেখে আমার নিজের কাছেই অবাক লাগে! যাদের কাছে, যাদের আদর, স্নেহে এতোটা বড় হয়েছি শুধু একজনের কারণে কি অবলীলায় তাদেরকে তুচ্ছ করা যায়।

সুখ–দুঃখ সম্পূর্ণ ভাগ্যের ব্যাপার। তোমার কাছ থেকে সুখ–দুঃখ যাই পাই না কেন, আমার সান্ত্বনা এটুকু যে, তা আমার ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকেই পেয়েছি। আমার কি মনে হয় জানো, আমার একা কোনো ইচ্ছা থাকতে পারে না, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, তোমার পছন্দই আমার পছন্দ, তোমার চাওয়াই আমার চাওয়া। আমার এমন কোনো কথা থাকতে পারে না যা তুমি জানতে পারবে না।

মাঝে মাঝে আমার নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে, তোমাকে এতো বেশি ভালোবাসি কেন? এর উত্তর আমিও কখনোই জানি না।

হতে চেয়েছিলাম একজন আদর্শ স্ত্রী। যার কাছ থেকে তুমি বা তোমার পরিবারের কেউ কখনোই কোনো কষ্ট না পাও, এটাই ছিল আমার ইচ্ছা। কখনোই এসব কথা তোমাকে শোনাতে চাইনি। আমার ইচ্ছে ছিল সময় হলেই এসব কিছু তোমরা বাস্তবে দেখবে। ইচ্ছে ছিল আমার যতো কষ্টই হোক, তোমরা যাতে আমার কাছ থেকে কোনো কষ্ট না পাও। তোমাদেরকে সুখী করতে পেরেছি এটাই হতো আমার সান্ত্বনা। চেয়েছিলাম তোমার লক্ষ্মী বৌ হতে যতোটুকু তুমি চাও তারচেয়ে অনেক বেশি লক্ষ্মী হতে।

আমার ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই। কোনো স্বার্থও নেই। আমার স্বার্থ এখানে এতোটুকুই তোমাকে চাওয়া, তোমাকে পাওয়া।

আমি এ দুঃখময় জীবনের ভার বয়ে ক্লান্ত। চাই মুক্তি। সে মুক্তি পাষাণ পৃথিবী আমাকে দিতে পারে। আমি এমনি একজন ভাগ্যহীনা নারী যার জীবনে ভালোবাসার অনুভূতি আলেয়ার আলোর মতো ক্ষণস্থায়ী।

আমার চারপাশে ভালোবাসার যে শক্ত প্রাচীর তুমি রচনা করেছো তাতে আমার পক্ষে সে দুর্ভেদ্য প্রাচীর ডিঙিয়ে অন্য পুরুষের ভালোবাসার আঙিনায় পা রাখা সম্ভব না। হয়তো ভাগ্য বিড়ম্বনায় পরিবারের চাপে পড়ে অন্য কারো সঙ্গে ঘর বাধতে হতে পারে।

কিন্তু আমার এ মনটাকে কি দিয়ে বোঝাবো বলো! সেটাতে তো শুধু তুমিই রয়েছো। অন্য কাউকে সেখানে স্থান দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যস্ত জীবনের মাঝ থেকে এক মুহূর্ত অবসর খুজে নিয়ে তুমি আমাকে নয়, আমার ভালোবাসাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করো, দেখবে আমার ভালোবাসা জয়ী হবে।

ভাগ্য যার সঙ্গে প্রতারণা করে, সুখ তার সঙ্গে মিত্রতা করে না কখনো। যতো দোষই তোমাকে দিই না কেন, তবুও তোমাকে খুবই ভালোবাসি।

আসলে খুব বেশি কোনো কিছুই ভালো না। তোমাকে খুব বেশি ভালোবাসি বলেই তোমার জন্য এতো বেশি কষ্ট পাই। তোমাকে পাওয়ার জন্যই আমার এতো আকুতি। তোমাকে খুব বেশি বিশ্বাস করি। কোনো যুক্তিই সেই বিশ্বাসের সামনে খাটে না। তোমার প্রতি আমার যে বিশ্বাস সেটা যদি কোনোভাবে ভাঙতে পারতাম তাহলে হয়তো তোমাকে হারানোর বিষয়টা আমার মেনে নেয়া সহজ হতো। যতোই সে বিশ্বাস ভাঙতে চাই, তোমার প্রতি আমার বিশ্বাসের প্রাচীর ততোই শক্ত হয়ে যায়।

তোমাকে অনুরোধের সুরে বলছি, জীবনের অবসরে যদি কখনো আমার জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয় তাহলে একবার হলেও ভেবে দেখো, আসলেই কি আমি তোমার অযোগ্য ছিলাম? তুমি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো, একটা মানুষ কতোটুকু ভালোবাসতে পারলে তার ইচ্ছা–অনিচ্ছা, শখ–আহ্লাদ, পছন্দ–অপছন্দ সব কিছু ছাড়তে পারে।

তোমাকে ভুলতে পারবো না জানি। আর ভুলতে চাইও না। কিন্তু এটাও চাই না যে, কারণে–অকারণে তোমার কথা মনে পড়ুক, তোমার স্মৃতিগুলো ভাবতে গিয়ে চোখে পানি আসুক। মাঝে মধ্যে মনে হয়, ভালোবাসা কি কষ্ট ছাড়া কিছুই দিতে পারে না! আমার কথা কি তোমার মনে পড়বে অলস মুহূর্তে, আনন্দ কিংবা কষ্টের মুহূর্তে? তোমার সুন্দরী স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কখনো কি আমার অসুন্দর মুখটা তোমার চোখে ভেসে উঠবে? এটা জেনে কোনো লাভ নেই জানি। তবুও জানতে ইচ্ছে করে। তোমাকে তো আমার জানাই হয়নি।

একটা মানুষের মন কেন এতো দুর্বোধ্য হয় বলো তো? যাকে এতো ভালোবাসি সে কেন আমার কাছে এতোটা অচেনা হয়ে থাকবে?

আমাকে একজন বলেছিল, একটা দূরের মানুষ খুব অচেনা থাকে, এক সময় সেই মানুষটা খুব কাছে আসে, সবার চেয়ে চেনা, আপন, প্রিয় হয়ে যায়। আবার সেই মানুষটাই আগে যতোটুকু অচেনা ছিল তারচেয়ে বেশি অচেনা হয়ে যায়।

আমি এ কথার সঙ্গে একমত হইনি। এখন দেখছি সেটাই আমার জীবনে বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।

পৃথিবীতে তোমার নামটা খুব বেশি ছড়িয়ে আছে। তোমার নামটা যখন কোথাও লেখা দেখি কিংবা কারো মুখে শুনি, আমার ভেতরটা একদমই এলোমেলো হয়ে যায়।

জানি না, জীবনে তোমাকে এক মুহূর্তের জন্য হলেও একান্তভাবে আমার স্মৃতিগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যায় কি না তোমার অবহেলায় গড়া আমার ভালোবাসার স্মৃতিসৌধে। আমার ভালোবাসার স্মৃতিসৌধ আজ শুধু বাসি ফুলগুলো বুকে করে দাড়িয়ে আছে। জানি না, কবে আমার ভালোবাসার স্মৃতিসৌধ তোমার ভালোবাসার গোলাপের আলোয় নিজেকে আলোকিত করে তুলবে।

আমার জীবনের ভালোবাসা আমাকে বড় বেশি একা করে দিয়েছে। সবার মাঝে থেকেও আমাকে তুমি নিঃসঙ্গ করে রাখো। আমার অবস্থা এ রকম যে, তোমাকে বোঝানো যাবে না। সারা রাত নির্ঘুম কাটে। যদি কখনো ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি তাহলে দুঃস্বপ্ন দেখে কিংবা এমনিতেই হাউমাউ করে কেদে উঠি। আর তখনই ঘুম ভেঙে যায়।

ভালোবাসার আগুনে এতো বেশি জ্বলতে হয় তা কখনোই আমার জানা ছিল না। প্রতিনিয়ত ক্ষয়ে যাচ্ছি। জানি না, কবে স্বাভাবিক হতে পারবো। আর ভালো লাগে না এই সীমাহীন নীরব কষ্ট। এর থেকে মুক্তি চাই।

মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো, আল্লাহ যদি আমাকে খুব কঠিন একটা অসুখ দিতো যাতে তুমি ফিরে আসতে, মিথ্যে করে হলেও বলতে, আমাকে তুমি সত্যিই খুব ভালোবাসো এবং আমার কাছে তুমি চিরদিনের জন্যই ফিরে এসেছো। ফিরে এসো, দুই হাত বাড়িয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, তুমি ফিরে এসো।

পৃথিবীর কোনো সুখই আমাকে এখন আর স্পর্শ করে না। তোমার ভালোবাসা আমাকে খুন করে ফেলেছে। নিজেকে আমার একটা মৃত মানুষ মনে হয়। যেভাবে বেচে আছি এটাকে বাচা বলে না। মনে হয় আমি একটা জীবন্ত লাশ।

তোমাকে এভাবে লিখতে হবে কখনোই তা ভাবিনি। তুমি আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব কিছু প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে আছো। তোমাকে কখনোই অভিশাপ দেবো না। কারণ তোমাকে ভালোবাসি।

আমি জানি, এখন তোমার ফিরে আসা সম্ভব নয়। তুমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমার জন্য ফিরে আসবে এ প্রতিশ্রুতি কি তুমি আমাকে দিতে পারো না? তখন তো তোমার একটা নিজস্ব মতামত থাকবে। জানি না, তোমার সুন্দরী বৌ তোমাকে কতোটুকু সুখী করবে যে সুখ পাওয়ার জন্য তুমি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছো। তবুও দোয়া করি, সুখ তোমার জীবনকে পূর্ণ করে রাখুক, দুঃখ যেন কখনো তোমাকে স্পর্শ না করে।

এতোসব দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝেও পরম করুণাময়ের কাছে রাত-দিন কেবল প্রার্থনা করি, কোনো এক অলৌকিক উপায়ে যদি আমার মনের আশা পূর্ণ হয়। অর্থাৎ তোমাকে ফিরে পাই।

আজ ভ্যালেন্টাইস ডে-তে তোমার ভালোবাসার অনুরোধ, তুমি ফিরে এসো।

তোমার লক্ষী বৌ

ঢাকা থেকে

লাল গোলাপ

বাংলাদেশ টেলিভিশন বা বিটিভিতে *লাল গোলাপ* নামে একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান হয়। দেশের সীমারেখা পেরিয়ে ভিন দেশে পরিচিতি পেয়েছেন এ রকম একজন ব্যক্তিত্ব অনুষ্ঠানটির পরিকল্পক ও উপস্থাপক।

অনুষ্ঠানটি একটু আলাদা মেজাজের। অনেকটা আর্ট ফিল্মের মতো স্লো। অনুষ্ঠানে সমাজ বা জাতির জন্যে অবদান রেখেছেন এ রকম বিখ্যাত ব্যক্তিদের হাজির করা হয় এবং আলাপচারিতা শেষে তাদের হাতে তুলে দেয়া হয় *লাল গোলাপ*।

অন্য এক কারণে আমাদের দেশে লাল গোলাপ বেশ জনপ্রিয়। একজন পুরুষ বা একজন নারী যার যার বিশেষ ব্যক্তিকে কথায় কথায় লাল গোলাপ উপহার দিয়ে থাকে। অনেকটা মিলার মতো সময় নেই, অসময় নেই, মইনকে ফোন করা।

আমার এ লেখা এ রকম এক গোলাপ নিয়ে।

আমরা দুজন একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। দেশের এক সীমান্ত জেলায় এর অবস্থান। আমার অবশ্য আরো একটা চাকরি আছে। ওটাই আমার মূল পেশা। চাকরিটা মিডিয়ার। প্রতিষ্ঠান দুটি একই মালিকের। একটিতে যেতে হয় সকালে আর অন্যটিতে সন্ধ্যায়। একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচয় আগেই দিয়েছি। অন্যটি হলো জ্ঞান অর্জন করতে হলে সেখানে যেতেই হয় এ রকম। এ প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে আমার এ লেখা।

কি করা উচিত আর কি উচিত না তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। মালিকের পরে প্রতিষ্ঠানের মূল চেয়ারে বসে ও। আর আমি সহযোগীদের একটায়।

এভাবে দিন কাটছিল। অচেনা ও কেমন যেন আমার সবচেয়ে বেশি চেনা হয়ে গেল। এর আগে কখনো ওকে দেখিনি, ও-ও না। এ অছিলায় ও অছিলায় ও বার বার আমার কাছে আসে, ছুতে চায় শরীর। তারপরও ভাবতে থাকি।

এভাবে কেটে যায় একটা সম্পূর্ণ বছর। আমি একটু বেশি রিয়ালিস্টিক হওয়ায় অ্যাডজাস্টমেন্টের বিষয়ের ওপর ঘুরপাক খায় ভাবনা। কারণ ওর ভাই-বোনেরা বাইরে থাকে। দেখতে সুন্দরী। আমার চাচাতো, মামাতো বা খালাতো বাদ দিলে কোনো ভাই-বোন বাইরে নেই। তাই ওর সঙ্গে নিজেকে একটু নিচু পর্যায়ের

মনে হয়। নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু ওর আচরণ বদলায় না। আমি হার মানি। ওর প্রতি আমার নেতিবাচক আচরণ ইতিবাচকে রূপ নেয়।

এমন সময় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রেস্টিজ ইসুতে ও চাকরি ছেড়ে দেয়। তারপরও আমাদের যোগাযোগ আগের মতোই চলে।

কোনো এক নভেম্বরে ওর জন্মদিন। সুনামি স্টাইলে বৃষ্টি ঝরছিল। ওই দিন ওর বাড়িতে শখানেক নিমন্ত্রিতদের ভেতর একমাত্র আমি উপস্থিত ছিলাম।

এভাবে কাটছিল সময়।

একদিন আমার মোবাইলের সংকেত ওর মোবাইলে পৌছাতেই ও লাইন কেটে দিল।

আবারও করলাম।

উত্তর একই।

এভাবে যতোদিন ফোন করেছি ও লাইন কেটে দিয়েছে।

নিজেকে স্বচ্ছ রাখতে ল্যান্ডফোনে রিং করিনি। পরে নষ্টালজিয়া রুখতে মেমোরি থেকে ওর নাম ইরেইজ করেছি। চেষ্টা করছি সৃষ্টিকর্তার দেয়া মেমোরি থেকেও তা মুছে ফেলার।

এমন সময় একটা ওয়েডিং কার্ড পেলাম, লাল গোলাপের মতো টকটকে। এক ব্যাংকার ওকে আপন করে নিচ্ছে।

টাইটানিক সিনেমার সেই ভালোবাসা যাকে ফ্রেমে বন্দী করে ওই বিয়েতে আমি একটা শোপিস টাইটানিক পাঠিয়েছি এবং একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, না, আর না। না হয় অপূর্ণই থাক জীবনের একটা অধ্যায়।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বাধা

– এম এম আকাশ আহমেদ

সবাই বলে পৃথিবী নাকি বদলে গেছে। কিন্তু সত্যি কি তাই? তাহলে আমাদের অভিভাবকরা কেন এখনো ভালোবাসাকে ভালো চোখে দেখছেন না?

সিনথিয়াদের বাড়ি আমাদের পাশের গ্রামে। ওর বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং বর্তমানে থানা পর্যায়ের আওয়ামী লীগের একজন নেতা। আয়-রোজগার কিভাবে করেন জানি না। তবে বাড়িতে বিল্ডিং। ওরা পাচ বোন, এক ভাই। ও মেজ। ওর বড় বোন মাস্টার্সে পড়ছেন। ওর অন্য ভাইবোনসহ সবাই ভালো ছাত্রী এবং সবাই ভদ্র ও সুন্দরী।

আমার চাচা এলাকার চেয়ারম্যান। আমার বাবা বিএনপি করেন। তাছাড়া দাদার রেখে যাওয়া প্রায় একশ বিঘা জমির তদারকি করেন। বাজারে দোকানও রয়েছে। বলতে গেলে দুই পরিবারের কেউ কারো চেয়ে কম না।

আর আমি?

ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে একটা বেসরকারি কম্পানিতে চাকরি করছি। অনুষ্ঠান করে বিয়ের প্রস্তাব দিলে নিশ্চয় কোনো পক্ষ থেকে না করতেন না। কিন্তু জানি না কিভাবে আমরা দুজন প্রেমে পড়লাম এবং গভীর ভালোবাসায় তলিয়ে গেলাম। সিনথিয়ার বড় বোন যেভাবেই হোক, ব্যাপারটা জানলেন আর যথানিয়মে দুপক্ষকে জানিয়ে দিলেন।

মতের বিভিন্ন অমিল থাকলেও আমাদের দুজনের বাবা একটা সিদ্ধান্তে পৌছালেন যেই যেভাবে হোক, এ সম্পর্ক এখুনি শেষ করে ফেলতে হবে। কিছুতেই এই ভালোবাসাকে প্রশ্রয় দেয়া যেতে পারে না। তারা

নানানমুখী কর্মকাণ্ড ঘোষণা করলেন। যেমন ওর বাবা–মা ওর প্রতি যে নানানমুখি অত্যাচার শুরু করলেন, তা নিচের মতো –

এক. ওকে বলা হলো যেন কিছুতেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখে এবং ওর বইপত্র জামা–কাপড়, ড্রয়ারসহ সব কিছু তল্লাশি করা হলো যাতে কোথাও ও আমার ছবি অথবা চিঠি লুকিয়ে রাখতে না পারে।
দুই. বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষেধ। যদিও বা বিশেষ কোনো কারণে বের হয় তবে সঙ্গে ওর বাবা বা ভাই নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে কাজ করেন।
তিন. এলাকার সব ফোনের দোকানে বলে দেয়া হলো যে, সিনথিয়া ফোন করতে এলে যেন ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়।
চার. টাকা পয়সা ওর হাতে দেয়া নিষেধ। সব সময় চোখে চোখে রাখা।
পাচ. আমাকে ভুলে যাবার জন্য ওর বোন এবং ভাবীদের বার বার মানসিক টর্চার। ওর বাবা এবং মামার মাঝে মধ্যে শারীরিক প্রহার। পানি পড়া, তাবিজ–কবজ ইত্যাদির ব্যবহার করতে ওকে বাধ্য করা।
আর আমাকে আমার পরিবারের সবাই বেশ কয়েকবার বোঝালেন। কিন্তু আমি তা না শোনাতে তারা যা করলো তা নিচের মতো –
এক. গালাগাল অকথ্য ভাষায় এবং ক্রমাগত বাড়ির সবার দুঃর্ব্যবহার। মানসিক টর্চার।
দুই. সিনথিয়াকে আমার বাবা বললেন যে, আকাশের চরিত্র জঘন্য খারাপ। ওর কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। হাসপাতালে পর্যন্ত মেয়েদের যেতে হয়েছে।
তিন. বিশাল সম্পত্তি থেকে বহিষ্কার করার হুমকি।
চার. শারীরিক প্রহার করে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া।
পাচ. এরপর ঢাকায় চলে এলে অন্য ভাইদের মাধ্যমে প্রস্তাব করলেন যদি সিনথিয়াকে ভুলে যাই তবে আমাকে এক লাখ টাকা দেয়া হবে এবং পৃথিবীর যেকোনো মেয়েকে বিয়ে করাতে তাদের আপত্তি নেই।
অতঃপর আমার মা মোবাইলে কান্নাকাটি শুরু করলেন। তার অনুরোধে গত রোজার ঈদে দেশে যেতেই চারদিক থেকে মামা–চাচাসহ সবাই বিয়ের জন্য চাপ দিলেন।
আমার ভাইয়েরা তাদের সুন্দরী শ্যালিকাদের লেলিয়ে দিলেন।
চতুর্মুখী হামলায় ঈদের পরদিন বাড়ি থেকে পালালাম। এখনো অজ্ঞাত অবস্থায় আছি।
তবে হ্যা পাঠক, আমার ভালোবাসাকে এখনো শ্রদ্ধা করি। আমরা দুজন এখনো আমাদের সিদ্ধান্ত অটল আছি। যতো ঝড় আসুক, আমরা পৃথক হবো না। আমরা অবশ্যই একদিন জয়ী হবো।
যদিও ভালোবাসা দিবসে আমরা দুজন থাকবো দেশের দুই প্রান্তে, তবুও আমার দুঃখ নেই। সবাইকে ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে আশা করি পৃথিবীর অন্য সব বাবা–মায়েরা যেন তাদের সন্তানের সঙ্গে উপরোক্ত আচরণ না করেন।

শিবচর, মাদারীপুর থেকে

ডায়রির ছেড়া পাতা

- রোহিনী

রোজ,

হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে বলেছিলে –
হাত ধরো – পরিশুদ্ধ জল দেবো তোমায়
দেবো নিকানো উঠান, গৃহস্থালী
পুরোটা জীবন – সব।

চোদ্দ বছরের এক কিশোরী তোমার হাত ধরেছিল। স্বপ্ন, ভালোবাসা আর মুগ্ধতা নিয়ে তোমার চোখে চোখ রেখেছিল। আর তুমি অপবাদের নোংরা জলে আমায় ডুবিয়ে একদিন পালালে।

তুমি যদি চাও, সুরভিত ভোরের বাতাসে তোমার দুঃখগুলো ধুয়ে দেবো। কতো মিথ্যে হয়ে গেল তোমার সেই কথাগুলো। ... তারপর কুড়ি বছর পরে তোমার টেলিফোন। লুকোতে চাইলে, পারলে না তো। আগের মতোই জানতে চাইলে, কেমন আছি। একটুও পাল্টায়নি তোমার কণ্ঠস্বর।

তুমি তোমার কথা বললে। আমিও আমার কথা বললাম। রিসিভার রাখার পরে আমার কি হলো জানি না। দীর্ঘ দিনের চেপে রাখা ভেতরের কষ্টগুলো অশ্রু হয়ে বাধভাঙা জোয়ারের মতো আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল অনেক বছর পেছনে। হালকা মেঘের মতোই উড়তে থাকলাম আমি।

দক্ষিণের ছোট্ট একটি দ্বীপ। এক চিলতে সবুজ ভালোবাসা। এ জলজ জনপদে আশ্চর্য বৈচিত্রে ভরা মানুষের মন। দিগন্ত প্রসারিত সহজ শস্যের ক্ষেত। অবিরল বয়ে চলা নদী, নীল আকাশ, কাশের শুভ্র অরণ্যে পাখিদের ওড়াউড়ি। এ দ্বীপের কোথায় না আছে আমাদের স্মৃতি। জলের সিড়ি বেয়ে নেমে আসা রূপালী ইলিশের ঝাক। পাল তোলা নাও। বৈঠার ঘায়ে অবিশ্রাম ভেসে যায় আমার কৈশোর, আমাদের যৌবন।

তুমি ছিলে আমার কিশোর বেলার সঙ্গী। আজও তোমায় ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি ফেলে আসা সেই দিনগুলোর কথা।

শ্যামসুন্দর, টগবগে দুরন্ত এক কিশোর ছিলে তুমি। কথা বলতে গুছিয়ে, খুব সুন্দর করে। ঝাকড়া চুলে কাজী নজরুল ইসলামের মতোই লাগতো। আমরা আড়ালে তাই বলতাম। জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের ওপর তোমার অপরিসীম প্রভাব ছিল। অভিনয়, আবৃত্তি, বিতর্ক সব কিছুতেই সমান পদচারণা ছিল তোমার। তুখোড় বক্তা ছিলে তুমি। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলে। দেশ স্বাধীনের পরে স্কুলে ফিরে এলে অন্য রূপে। এক বিপ্লবী কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। চলা–বলায় এ বয়সেই অনেক পরিপক্ক সংযত ছিলে তুমি। মেয়েরা তোমাকে খুব পছন্দ করতো। অনেক সিনিয়র মেয়েও তোমাকে পছন্দ করতো। কিন্তু তুমি পছন্দ করতে আমাকে। সে কথাটাই জানালে তোমার এসএসসি পরীক্ষার পরে।

তুমি তোমার ভালোবাসার কথা বললে। কখনো চিন্তাই করিনি তোমায় ভালোবাসবো। দুজনে দুজনের এতো কাছে আসবো, ভালোবাসার প্লাবনে ভাসতে থাকলাম আমরা। পালিয়ে প্যালিয়ে দেখা করা, কথা বলা আমাদের প্রতিদিনের রুটিনে পরিণত হলো। পারিবারিক বাধা উপক্ষো করে সিনেমা দেখা, গল্প করা সবই চললো। বলার চেয়ে তোমার কথা শুনতাম বেশি। এরপর আরো কাছে এলাম আমরা। একজন অন্যজনকে না দেখে থাকতে পারতাম না। তোমার রেজাল্ট ভালো হলো। তুমি কলেজে ভর্তি হয়ে চলে গেলে। আমাদের যোগাযোগ থাকলো আগের মতোই। ইতিমধ্যে আমাদের সম্পর্কের কথা জানাজানি হয়ে গেলে পারিবারিক চাপে নীরব থাকতে চাইলাম। পড়াশোনায় তেমন মন দিতে পারিনি। তার মাশুল দিলাম এসএসসি পরীক্ষায়। রেজাল্ট তেমন ভালো হলো না। তুমি রক্ষী বাহিনীর তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াতে, ক্লান্ত হয়ে ধরাই পড়ে গেলে। আমি তো জানি, তুমি কোনো অন্যায় করোনি।

পড়াশোনা শেষে তুমি চাকরি নিলে। এরপর আমাদের দূরত্ব বাড়তে বাড়তে এক সময় তুমি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেলে। তোমার এভাবে হারিয়ে যাওয়া আজও আমার কাছে রহস্যময় হয়ে আছে।

প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট আর ভালোবাসার এ অপমান আমাকে পাগল করে তুললো। মনে হতো তোমাকে ছাড়া বাচতে পারবো না।

কষ্টের অতলান্তিকে হারিয়ে যেতে যেতে ক্ষীণ এক আলোর রশ্মি ধরে আবার ফিরে এলাম নিজের জগতে। দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু করলাম। লেখাপড়া, চাকরি আর লেখালেখি করে নিজের বৃত্তে আলাদা জগৎ তৈরি করে নিলাম।

তুমি আবার ফিরে আসতে চাইলে আমার জীবনে। তোমায় ফিরিয়ে দিলাম। নিজে কষ্ট পেয়েছি খুব, তোমাকে জানতে দিইনি। যে বেদনা আমার অন্তরে প্রবাহিত ছিল তার অরাদ্ধ ধারায় আমাকে ভাসিয়ে নেয়নি। এতো দিনে আমি আনন্দ বেদনার সঙ্গে সহঅবস্থানে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। মানুষের জীবন তো আর থেমে থাকে না। আমিও সংসারি হলাম। বন্ধুর মতো উদার স্বামী, ফুলের মতো দুটো সন্তান। ওদের নিয়ে আমি আজ পরিপূর্ণ। ওদের ভালোবাসা নিয়ে পৃথিবীতে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই।

আমি বিশ্বাস করি, প্রেমের মহত্ব প্রার্থনায় নয়। একটি প্রসারিত হাতকে ধারণ করে চিরকালের সঙ্গ কামনায় নয়। ইচ্ছার পরিসমাপ্তিতেও নয়। প্রেমের মহত্ব প্রতিদানহীন একটি উদার আনন্দময় ত্যাগে।

তারপরও বর্ষণমুখর কোনো রাতে যদি ঘুম ভেঙে যায়, আমি জানালায় গিয়ে দাড়াই। তখন স্মৃতির কৌটা থেকে ছড়ানো পাপড়ির মতো আমার দুঃখগুলো ঝরে পড়ে। বৃষ্টির মতো আমিও অঝোরে কাদি। বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে। হৃদয়ের ভেতরে তখন কাউকে অনুভব করি।

পরিচিতজন অপরিচিত হয়ে যায়। যে মানুষটাকে প্রাণ ভরে চেয়েছি তাকে পাইনি। আর যাকে পেয়েছি, জীবনের প্রয়োজনে তাকে আমার দরকার ছিল। না পাওয়ার যন্ত্রণা আছে আবার প্রগাঢ় সান্নিধ্যের আনন্দও আছে। প্রেমের শূন্যতা আছে। কিন্তু ভালোবাসার সরোবর পূর্ণই আছে আমার।

প্রেম আমার চেতনায় অনাবিল এক স্বর্গীয় সুবাস। এ প্রেম আমায় সমৃদ্ধ করেছে, সহিষ্ণু করেছে। ঈশ্বরের প্রতি নতই করেছে কেবল।

ঢাকা থেকে

অচেনা

এক যুগেরও বেশি সময়। আমাদের প্রেমের সম্পর্ক অটুট ছিল। এতোটা বছরে আমরা খুব বেশি ঘনিষ্ঠ সময় কাটাতে পারিনি বা খুব কাছাকাছি আসতে পারিনি। পারিবারিক সমস্যা এর অন্যতম কারণ ছিল। আমার পরিবার কোনোভাবেই আমাদের প্রেমের সম্পর্কটাকে মানতে পারেনি।

আমি ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী। সুন্দরী এবং চাকরিজীবী বাবার আদুরে মেয়ে। আর সে ডিগ্রি ফেল। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তার কোনো অযোগ্যতা তার প্রতি আমার ভালোবাসাকে কমাতে পারেনি। তাকে পাগলের মতো ভালোবেসেছি। আমার সকল চাওয়া-পাওয়া ছিল তাকে ঘিরে।

পারিবারিক শত বাধার পর অত্যন্ত গোপনে আমরা বিয়ে করে ফেলি। বিয়ের ব্যাপারটা গোপন রাখতে পেরেছিলাম অনেক দিন। তারপর একদিন সব কিছু জানাজানি হয়ে গেল। পর দিনই আমাকে এক কাপড়ে বাড়ি ছাড়তে হলো।

শুরু হলো শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ ও বেকার স্বামীর সঙ্গে নতুন জীবন। যে সচ্ছলতার মধ্যে বড় হয়েছি, এখানে এসে পড়লাম তার বিপরীত দিকে। অনেক মানসিক অত্যাচার সহ্য করেছি, প্রিয় মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে। এর মধ্যে নিজের যোগ্যতায় একটা চাকরি জুটিয়ে ফেললাম। সংসারে অশান্তির কারণে তা ছাড়তে বাধ্য হলাম।

নতুন করে চিনতে শুরু করলাম ভালোবাসার মানুষটিকে। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে যাকে নিজের সমস্ত কিছু দিয়ে ভালোবেসেছিলাম এবং চিনেছিলাম পরে বুঝলাম আমার এই চেনা, জানা কতো ভুল? নেশায় আসক্ত এই মানুষটাকে আমার অচেনা মনে হলো।

সুখ, স্বাচ্ছন্দ, সচ্ছলতা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সব কিছু ছেড়ে যাকে নিয়ে বাচার স্বপ্ন দেখেছিলাম। এখন তারই জন্য মরতে ইচ্ছা করে। সামান্য কারণে যখন গায়ে হাত তোলে তখন মনে হয় জীবনের চরমতম ভুল করেছি

তাকে ভালোবেসে। নিজের সুন্দর ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছি। তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারি না। কারণ তারই সন্তানের মা আমি। নিজের সন্তানের কাছে কি জবাবদিহি করবো?

এখন আমার বেচে থাকার একমাত্র অবলম্বন আমার সন্তান। যদি বাচি তার জন্যই বাচবো।

নাম ঠিকানা বিহীন

মোবাইল হারালো

- ভালোবাসা ফুরালো

এস এম জাভেদ আনোয়ার

ষোড়শী পুতুল। চেহারায় বালিকা ভাব এখনো কাটেনি। কিন্তু হিসাবে বড় পাকা। পাড়ার কোন ছেলেকে কিভাবে টোকা দিলে চাইনিজ বা কফি শপ ইত্যাদির টাকা খসানো যাবে এ ব্যাপারে পুতুল বেশ অভিজ্ঞ। অল্প বয়সেই নারী সুলভ প্রতারণা, ছলনা ভালোই রপ্ত করেছে।

ওর এই টাকা খসানো স্বভাব সম্বন্ধে সকলেই জানে।

তবে লেটেস্ট খবর হলো, পাড়ার সুমনভাইয়ের সঙ্গে কয়েকদিন ঝোলাঝুলি করে পটিয়ে পুতুল একটা নকিয়া 2100 অর্জন করলো।

এরপর বেশ কিছু দিন পুতুলের স্বভাব *বহুগামী* থেকে *সুমনগামী* হলো।

কিন্তু সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বশত একদিন মার্কেট থেকে ফেরার পথে মোবাইলটা ছিনতাই হয়ে গেল। মোবাইল ব্যবহারে অভ্যস্ত পুতুল *অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস* বা *প্রেস্টিজ* হ্রাসের ভয়ে সুমনভাইয়ের কাছে আরেকটা সেট চাইলো। কিন্তু সুমনভাইয়ের তাৎক্ষণিক অপরাগতায় পুতুল বিন্দুমাত্র করুণা করলো না। অথর্ব, অক্ষম ইত্যাদি বেশ কিছু *মধুর সম্ভাষণ* দিয়ে প্রস্থান করলো।

এরপর থেকে পুতুলকে মোড়ের চার তলা বাড়িটির মালিকের ছেলের সঙ্গে ঘুরতে দেখি।

যদিও দেখি না (কারণ ভ্যানিটি ব্যাগে থাকে) তবে অনুমান করতে পারি যে, পুতুলের এখন একটা নতুন মোবাইল আছে।

মুখে দাগ ভালোবাসা ভাগ

রাসেল টগবগে তরুণ। পাচ ফুট দশ ইঞ্চি, পেটানো শরীর, খুব ভদ্র, স্মার্ট। মেয়েদের কথা বলতে পারবো না, তবে আমরা ছেলেরাই রাসেলকে দেখলে সামান্য ঈর্ষা অনুভব করি। আনমনে ভাবি, কি হতো যদি ও একটু কম সুন্দর হতো!

রাসেলের ছোট বোনের বান্ধবী তানিয়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে, বিস্তর চোখের জল বিয়োগ করে রাসেলের ভালোবাসার স্বীকৃতি আদায় করলো। বছর তিনেক চললো এই ভালোবাসা। তানিয়া স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে আর রাসেল ইউনিভার্সিটিতে। অটুট তাদের ভালোবাসার বন্ধন।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ পৃথিবীতে নেই বলেই হয়তো একদিন রিকশায় পড়ে আসার সময় ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। এ রকম দুর্ঘটনায় সাধারণত হাত–পা ছিলে যাওয়া ছাড়া আর কিছু হয় না।

রাসেলের কপালের বামপাশের প্রায় দুই ইঞ্চি জায়গা গভীরভাবে কেটে গেল।

এরপর থেকে রাসেলের সুন্দর মুখের দিকে তাকালে চাদের কলঙ্কের মতো সবার আগে চোখে পড়ে দুই ইঞ্চি কাটা দাগ। তারপরের ব্যাপারটা আরো স্বাভাবিক। যে সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে তানিয়া এক সময় ঘুমের ওষুধ খেয়েছিল সে মুখটাই এখন নাকি তার কাছে ডাকাতের মুখের মতো মনে হয়। এবং ডাকাত সদৃশ কাউকে নিশ্চয়ই ভালোবাসা যায় না!

সমস্যা নেই এবার যাই

এগারোজন সদস্যের বিশাল পরিবারের পঞ্চম ফাহমিদা। পরিবারের আর্থিক অবস্থান *নুন আনতে পান্তা ফুরায়* টাইপের না হলেও অন্তত *কলা আনতে রুটি ফুরায়* টাইপের। কিন্তু প্রেম ভালোবাসা তো কোনো অবস্থা মানে না।

এই ফাহমিদার সঙ্গে পরিচয় হয় মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে সাইফুলের। *All roads lead to Rome*–এর মতোই All পরিচয় Lead to ভালোবাসা। দুজনের বয়সই ছিল অল্প। তাই ভালোবাসাটাও ছিল উথাল–পাথাল।

চিরকালের আলসে সাইফুল বেশ পরিশ্রমী হয়ে উঠলো। দুই তিনটা টিউশন করে ফাহমিদার সমস্ত খরচ চালাতো। ক্লাস নাইন থেকে এইচএসসি পর্যন্ত ফাহমিদার জন্য বাবা মায়ের খাওয়ানো ছাড়া অন্য কোনো খরচ করতে হয়নি। পরিবারের সবাই জানলেও এ ব্যাপারে কিছু বলতো না। টানাপোড়েনের সংসারে একটু অর্থ সাশ্রয় খারাপ কি?

বছর খানেক পরে ফাহমিদার দুই ভাই মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ায় ওদের অবস্থা বেশ ফিরে গেল। আর্থিক অবস্থা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ফাহমিদার ভালোবাসার ভাটার টান লেগেছে বুঝতে পেরে সাইফুল বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার অজুহাতে সাইফুল প্রথম বলেই বোল্ড। তারপর আর কি! ভালোবাসার নারীকে না পেয়ে মাদককে ভালোবাসতে শুরু করে সাইফুল। আমি অবশ্য সাইফুলেরই দোষ দেবো। কারণ ওর বোঝা উচিত ছিল *নারীর ভালোবাসার সঙ্গে আর্থিক দৈন্যতার চিরন্তন বৈরিতা আছে*।

অনার্স না বিকম প্রিয়া মেলে পেখম

আরাফাত ছাত্র হিসেবে ভালো। এসএসসি ও এইচএসসি দুটোতেই খুব ভালো রেজাল্ট। চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে বোটানিতে চান্স পেয়েছিল। কিন্তু সেশন জটের কারণে ক্যারিয়ার গড়তে দেরি হবে। ফলে সমবয়সী প্রেমিকা তানিকে হারাতে হবে। তাই আরাফাত সিটি কলেজে বিকম–এ ভর্তি হলো যাতে পাস করে তাড়াতাড়ি প্রফেশনাল লাইফে ঢোকা যায়। আর তানি ওই কলেজেই ইংলিশ–এ অনার্সে ভর্তি হলো। এটা গত বছরের ঘটনা।

এক বছর পরে আরাফাত বুঝতে পারে তানির মাঝে কেমন যেন উদাসীনতা কাজ করছে। এক বন্ধুর মাধ্যমে ও শুনতে পায়, তানি বলছে, ইংলিশে অনার্স আর বিকম–এর মাঝে নাকি অ্যাডজাস্ট হবে না। ভুলটা আরাফাতেরই। কারণ ও জানতো না, *মেয়েদের কাছে সম্মান এবং আর্থিক নিরাপত্তাটাই ভালোবাসা*।

পরিশিষ্ট

উপরের সমস্ত ঘটনাই আমার বন্ধু ও পরিচিতদের জীবনে ঘটেছে। শুধু ছেলে এবং মেয়ের নামগুলো পাল্টে দেয়া হয়েছে। এসব ঘটনার কারণেই হয়তো বা ইদানীং আমার কেন জানি একটা বিউটি পার্লার দিতে ইচ্ছে হয় যেখানে মেয়েদের শারীরিক সৌন্দর্য না, বরং মানসিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হবে।

চট্টগ্রাম থেকে

প্রার্থনা

- জমিলা চিশতী- উস- সাবেরী

এখানে গ্রামের বিস্তীর্ণ সর্ষে মাঠের মাঝ বরাবর চলে যাওয়া পথের এলোমেলো বাতাসে চুপিসারে বহু কাহিনী রচিত হয়। যখন রিকশায় চড়ে সেই গ্রামীণ পথের যাত্রী হলাম তখন গভীর নীরবতা আমায় চমকে দিল। শব্দবহুল রাজধানীর কোলাহলের পর কান যেন নিঃশব্দতার ব্যথা অনুভব করলো।

কোথাও কেউ নেই। চারপাশে যতোদূর দৃষ্টি যায়, কেবল সর্ষে ফুলের মেঠো গন্ধে ভরা বাতাস জড়াজড়ি করে আছড়ে পড়ছে দূর গ্রামের বুকে।

কতোদিন পর আবার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলি, হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে মাই সুইট লাভলি ভিলেজ!

স্লুইস গেট স্থাপনের দরুন শৈশবের সেই সাতার কাটা খালটা আরো সরু হয়েছে। পুকুর শুকনো। ঠিক আগের দিনের মতোই সৎ লোক গ্রামে খুজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু তাদের সরল আন্তরিকতার এতোটুকু কমতি নেই। শীতের পিঠে, গাছের সবজি দিয়ে ওদের আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে বলি, হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস ডে।

আমার জন্মস্থান টামনী গ্রামকে সৎ লোক প্রসবে কৃপণতার জন্য মোটেই দোষ দিই না। কারণ সমস্ত বিশ্বই এখন সৎ ও চরিত্রবান লোক সংকটে ভুগছে। তবু একান্তভাবে চাই ভ্যালেন্টাইনস ডে সবার জন্য সুন্দর, সৎ প্রেম ও সুস্থ, কর্মঠ, সৃষ্টিশীল জীবনধারা নিয়ে আসুক। সেই কর্মব্যস্ততার ফাকে আমরা দল বেধে ছুটে যাবো গ্রামের বুকে। যে কৃষকটি সারা দিন মাঠে কাজ করছে ছেড়া জামা গায় দিয়ে তাকে একটা জামা উপহার দেবো, যে কিশোরটি রাখাল বালক হয়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে তার হাতে বই তুলে দেবো, যে মা সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে পারছে না তাকে নিদেনপক্ষে এক প্যাকেট বিস্কিট উপহার দেবো।

এভাবে আমার দেশের মাটির টানে শেকড়ের সন্ধানে ভ্যালেন্টাইনস ডে কাটিয়ে সন্ধ্যায় আল্লাহপাকের দরবারে প্রার্থনা করবো, হে প্রভু, তুমি আমাদের সবাইকে ক্ষমা করো, সৎ পথ দেখাও। তুমিই তো সত্যিকার প্রেমের ভাণ্ডার। আমাদের সবার মাঝে সেই প্রেম শিখার আলো সঞ্চারিত করো।

ঠিকানা বিহীন

প্রেমিক ছিনতাই

- শাহেদ

হাই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই খালাতো বোন নাবিহার সঙ্গে আমার *দা কুমড়া* সম্পর্ক ছিল। দুজন একই স্কুলে, একই ক্লাসে পড়তাম। ক্লাস সিক্সের ফাইনাল পরীক্ষায় মাত্র দুই নাম্বারের জন্য সেকেন্ড হই। নাবিহা ফার্স্ট। ফার্স্ট হওয়ার আনন্দে খালাদের বাড়িতে রীতিমতো উৎসবের বন্যা বয়ে যায়। ফার্স্ট না হতে পারায় মা আমাকে তেমন কিছু বললেন না। কিন্তু বাবা পিঠের ছাল তুলে ছাড়েন! খালা নাবিহাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসেন সবাইকে মিষ্টিমুখ করাতে।

রাগে অপমানে আমার গা জ্বলতে থাকে। তাছাড়া নাবিহার হাটার ভঙ্গিমায় মনে হতে থাকে সে যেন এভারেস্ট জয় করে এসেছে! খালার সামনে তেমন এটা গেলাম না আর নাবিহার সঙ্গে কথা বলা তো দূরে থাকুক, তার দিকে তাকাতেই আমার পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, ক্লাস সেভেনের ফাইনাল পরীক্ষায় নাবিহাকে এমন ছ্যাচা দেবো যে, রেজাল্টের অহংকার পচা ডোবায় পড়তে বাধ্য হবে। তখন গ্রামের মানুষ নিয়ে গিয়ে মিষ্টি খাইয়ে আসবো খালাকে আর তার মেধাবী মেয়েকে!

প্রথম দিন থেকেই শুরু করলাম ধুমসে পড়া। রাত দিন দেখাদেখি নেই। বন্ধুরা যখন খেলার মাঠে ক্রিকেট বল নিয়ে মাতোয়ারা তখন আমি পড়ার টেবিলে খালাতো বোনের শ্রাদ্ধ পড়ানোর আয়োজনে ব্যস্ত!

কিন্তু দৌড় শুরু করার সঙ্গে যে বান্দা সবচেয়ে আগে থাকে, দৌড় শেষে সবচেয়ে পরে ফিনিশিং লাইন স্পর্শ করার সম্ভাবনা তারই সবচেয়ে বেশি। হলোও তাই। ফাইনাল পরীক্ষা আসতে আসতে আমার পড়াশোনার গতি অনেক কমে গেল।

ফলাফল প্রকাশের দিন দুরুদুরু বুকে হাজির হই। ফল ঘোষণা শুরু হলো।

ফার্স্ট স্থান অধিকারী হিসেবে নাবিহার নাম স্যার ঘোষণা করলেন।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম আমার। আবারও সেকেন্ড স্থান নিয়ে তাহলে বছর পার করতে হবে!

এমন সময় সেকেন্ড স্থান অধিকারীর নাম ডাকা হলো। সে আমাদের সবার ঠাট্টার পাত্র মফিজুল ইসলাম। আমরা তাকে *পাগলা মফিজ* বলে ডাকি।

ঘামতে শুরু করেছি রীতিমতো। বাড়ি গিয়ে মুখ দেখাবো কি করে! থার্ড স্থানেও নেই আমার নাম! চতুর্থ স্থানে গিয়ে ঠেকেছে আমার রেজাল্ট।

ক্লাসের এক কোণে বসে বান্ধবী পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছে নাবিহা। হাসছে দাত কেলিয়ে।

রাগে পিত্তি জ্বলে যায় আমার। আজ পিঠে মুগুর ভাজা জুটবে ভেবে বাড়ি না গিয়ে মামার বাড়িতে গিয়ে উঠি। বড় মামাকে সব খুলে বললে মামা আমাকে নিরাপদে বাড়ি পৌছে দিয়ে মা বাবাকে অনুরোধ করেন আরেকবার সুযোগ দিতে।

মা বাবার সামনে আবারও প্রতিজ্ঞা করলাম পরের বার ফার্স্ট হবোই।

ক্লাস এইটে বৃত্তি পরীক্ষায় নাবিহা ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পায় আর আমি সাধারণ গ্রেডে। ক্লাসে সে বছর ফার্স্ট হতে না পারলেও সেকেন্ড স্থানটি উদ্ধার করতে পেরেছিলাম।

নাবিহা ততোদিনে স্টারে পরিণত হয়েছে। অসাধারণ সুন্দরী হওয়ার কারণে স্কুলের ছেলেরা তার জানেমান ভক্ত এবং মেয়েরা তার সইতে পরিণত হয়। স্যারদের কাছ থেকেও সে বাড়তি রকম সুযোগ সুবিধা পেতো।

ক্লাস নাইনে মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। নাবিহার মাথায় প্রেমের ভূত ঢুকিয়ে তার পড়াশোনার বারোটা বাজাতে হবে। এক ক্লাসমেটকে বললাম নাবিহাকে প্রেমপত্র লেখার জন্য।

সে ভয়ে অস্থির। নাবিহার মতো সুন্দরী, মেধাবী মেয়ে তার প্রেমে সাড়া দেবে কেনো!

কিন্তু তাকে অভয় দিয়ে বললাম, যতো রকম সাহায্য এবং বুদ্ধি লাগে দেবো।

আত্মহত্যার হুমকি-ধামকি দিয়ে শেষে নাবিহাকে কাত করা গেল। মানে সেও আমার বন্ধুকে ভালোবেসে ফেলে। আমার খুশি দেখে কে! বন্ধু আরেজকে বললাম, বেশি বেশি প্রেমপত্র না লিখলে প্রেম বেশি দিন টিকে থাকে না। দৈনিক কমপক্ষে একটা করে প্রেমপত্র লেন-দেন হতে থাকে তাদের মধ্যে। অধিকাংশ ক্লাস টেস্টে প্রথম হচ্ছি এখন আমি। নাবিহার অধঃপতন অব্যাহত আছে। ফাইনাল পরীক্ষায় আমি ফার্স্ট আর নাবিহা সেকেন্ড।

মামাদের নিয়ে নিজেই গেলাম খালার বাড়িতে মিষ্টি খাওয়াতে। নাবিহাকে সেদিন বাড়িতে দেখিনি!

ক্লাস টেনেও একই অবস্থা। আরেজ-নাবিহা প্রেমে মত্ত।

বন্ধুরা আমাকে বুদ্ধু ডাকতে শুরু করেছে। এমন সুন্দরী খালাতো বোন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে।

কিন্তু তাদের সাফ জানিয়ে দিই চিরকুমার থাকবো তবুও নাবিহাকে ভালোবাসা কিংবা বিয়ের চিন্তা মাথায় আনবো না। সে আমার জনম জনমের শত্রু।

এসএসসিতে দুজনই স্টার মার্কস পাই আমরা। মনে মনে ওর যতোটা ক্ষতি আমি আশা করেছিলাম তার কিছুই হয়নি। ও আট বিষয়ে লেটার মার্কস পায়। আমি সাতটায়। নটর ডেম কলেজে ভর্তি হই। ও স্থানীয় এক গার্লস কলেজে।

এসএসসিতেও স্টার মার্কস পাই দুজনই।

এরপর দুজনই ঢাকা ইউনিভার্সিটি। আরেজ রাজশাহী ইউনিভার্সিটি।

টিএসসিতে নাবিহা এক জনপ্রিয় মুখে পরিণত হয়েছে। স্মার্ট, সুন্দরী তরুণীদের প্রতি পুরুষদের দুর্বলতা থাকবেই। নাবিহার অসংখ্য পুরুষভক্ত জুটে যায়। নাবিহার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ক্যাম্পাসের অনেক ছেলেকে দেখেছি গর্বে বুক ফুলাতে। তখনো নাবিহার সঙ্গে আমার আলাপ বন্ধ। কাউকে বলিনিও যে সে আমার খালাতো বোন। বন্ধুরা যখন নাবিহাকে দেখিয়ে আমাকে বলে, *দোস্ত রে দেখ না ঐশ্বরিয়ার ক্লোন,*

আমি শুধু হু, হ্যা ইত্যাদি শব্দ করে সরে আসি সেখান থেকে। নাবিহার এই তারকাখ্যাতি আমাকে ভীষণভাবে ঈর্ষান্বিত করে। প্রকাশ করি না।

গত বছর ভরদুপুরে একদিন দাড়িয়ে আছি টিএসসির দক্ষিণ কোণায়। লোকজনের চলাচল তেমন একটা নেই। হঠাৎ সামনে দিয়ে শা করে একটি পাজেরো চলে যায়। চোখে এসে কি যেন একটা প্রবেশ করে। কাটার মতো বিধতে থাকে। যন্ত্রণায় বসে পড়ি চোখ বন্ধ করে। এক আঙুল দিয়ে বের করার চেষ্টা করি চোখের ময়লা। কিন্তু হাতের ময়লা লেগে আরো বেশি জ্বালা করতে থাকে। মনে হলো অন্ধ হতে চলেছি। চোখ বন্ধ করে কচলাতে কচলাতে আল্লাগো, আল্লাগো করে চলেছি। এমন সময় চিবুকে একটা নরম হাতের স্পর্শ পাই। কষ্ট করে বাম চোখ খুলে তাকাই। নাবিহা!

হাত ধরে রাস্তা থেকে উঠিয়ে সে আমাকে ঘাসের ওপর বসায়। এরপর ওড়নার এক কোণা পাকিয়ে বাম হাতের দুই আঙুল দিয়ে ডান চোখটা ফাক করে ওড়নার কোণা দিয়ে চোখের ময়লা বের করার চেষ্টা করে।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি বাকরুদ্ধ। জীবনে প্রথমবারের মতো খালাতো বোনের স্পর্শ। অজানা এক উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছি। বাম চোখ খুলে তাকাতেই নজর চলে যায় নাবিহার জামার হাতার ফাক দিয়ে তার বগলে। হাতটা উচু হয়ে থাকার কারণে এবং সূর্যের আলো পড়াতে তার বগল দিনের আলোকের মতো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বগলের ঘন কালো চুলগুলোতে বিন্দু বিন্দু ঘাম। নাকে একটা ঘ্রাণ পেলাম। সে ঘ্রাণ আমাকে একটা জৈব তাড়নার দিকে ঠেলে দিল যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। অপলক তাকিয়ে আছি তার বগলের দিকে! এতোটা আকর্ষণ আমাকে কোনো কিছু আগে করেছে কি না ভাবতে পারছি না! এর আগে সরাসরি কোনো মেয়ের বগল দেখিনি। মেয়েদের বগল দেখলে মাথা যে এভাবে ঘুরতে থাকে জানা ছিল না।

এরই মধ্যে নাবিহা চোখে ঢোকা ময়লাটি বের করে এনেছে।

আমি কোনো কথা বললাম না।

কোনো কিছু না বলে সেও চলে গেল।

রাতে ঘুমাতে গেলাম। ঘড়ির কাটা ঘুরেই চলে। ঘুম আসে না। চোখের সামনে ভাসছে শুধু নাবিহার বগলের সেই দৃশ্য। এপাশ–ওপাশ করছি। ঘুম হারাম হয়েছে বুঝতে পারি। শেষমেষ বাথরুমে গিয়ে *হাল্কা* হয়ে আবার বিছানায় যাই। ঘুম এলো না অবশিষ্ট রাতেও। চোখের সামনে একই দৃশ্য।

সকালে বন্ধু ফাহিমের বাসায় যাই। ফাহিমকে সব খুলে বলি। তাকে বলি আমার বোধহয় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দেখানো লাগবে!

শুনে ফাহিম হাসিতে লুটোপুটি খায়। *ওরে হাদারাম*। ফাহিম বলে, তাহলে দুনিয়ার সব পুরুষকেই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দেখানো লাগবে!

কেন? সবিস্ময়ে জানতে চাই।

কারণ, ফাহিম বলে এমন কোনো পুরুষ মানুষ নেই মেয়েদের বগল দেখে যার মধ্যে কেমন কেমন করে না। বলতে পারিস যে পুরুষের এই কেমন কেমন করে না তারই বরং ডাক্তার দেখানো দরকার। সব পুরুষই সুন্দরী মেয়েদের বগলের প্রতি দুর্বল। মেয়েদের বগল হচ্ছে পুরুষদের প্রলুব্ধ করার অস্ত্র। সিনেমার নায়িকা কিংবা বিজ্ঞাপনের সুন্দরী মডেলরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে ওই স্থানটি দেখায় তা কি বোঝার ক্ষমতা তোর নেই? শোন, সবাই ওই স্থানটির প্রতি লোভাতুর হলেও প্রকাশ্যে বলে না তা। সুতরাং তুই ভুল করিসনি। পুরুষের সহজাত বৈশিষ্ট অনুসারেই তুই নাবিহার বগলের প্রেমে পড়েছিস।

বুঝতে বাকি রইলো না ফাহিম মেয়েদের বগলের উপর ছোটোখাটো একটা থিসিস সেরে ফেলেছে। এ কথা তাকে বলতেই সে অশ্রাব্য একটা গালি দিয়ে আমাকে নিয়ে গেল তার কম্পিউটারের সামনে। *প্রমাণ দেখাচ্ছি শালা তোকে* বলেই সে ইন্টারনেটে প্রবেশ করলো। Yahoo সার্চ বক্সে Girl's armpit (মেয়েদের বগল)

লিখেই সার্চ-এ ক্লিক করলো। আমার দ্বিতীয়বার অবাক হওয়ার পালা। আশ্চর্য! শুধু মেয়েদের বগলের ওপর হাজার হাজার ওয়েবসাইট আছে!

ফাহিম আমাকে কয়েকটি ওয়েবসাইট ওপেন করে দেখালো। সেগুলো পড়ে তো আমি থ! ইওরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার ওয়েবসাইট যেমন আছে মেয়েদের বগল নিয়ে তেমনি ইনডিয়া, চায়না, জাপান, মধ্যপ্রাচ্যসহ অনেক দেশের হাজার হাজার ওয়েবসাইট আছে। নারীর বগলের আকর্ষণীয় ক্ষমতা, তাদের বগলের ঘ্রাণের পুরুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা, তাদের বগলের চুলের গুরুত্ব, নারী-পুরুষের জৈবিক ক্রিয়ায় নারীকে তৃপ্তিদানে তাদের বগলের গুরুত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি এসব ওয়েবসাইটগুলোতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত। আছে চুলসহ অসংখ্য সুন্দরীর বগলের ছবি। আছে অসংখ্য ছোট গল্প যেগুলোর বিষয় শুধু নায়িকার বগল।

ইনডিয়া দক্ষিণী সুন্দরী অভিনেত্রী কাব্য মাধবনের বগলের ওপর একটি ওয়েবসাইট আছে সেটাকে ভক্তারা এই নায়িকার বগল নিয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারবেন। কারণ এই সুন্দরী নায়িকা বগলে চুল নিয়ে অভিনয় করেন। শেষ সিনেমাতে চুল ফেলে দেয়ায় ভক্তদের ক্ষোভ ঝরে পড়েছে তাদের মন্তব্যে। এছাড়া পাওয়া গেল বিভিন্ন শরীর বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিস্তারিত ফলাফল কেন মেয়েদের বগল পুরুষের কাছে এতোটা আকর্ষণীয়।

পাওয়া গেল অনেক জরিপের ফলাফল। পুরুষেরা মেয়েদের কেমন বগল পছন্দ করে। হাজার হাজার পুরুষ অংশগ্রহণ করেছে এই জরিপে। তাদের নিজস্ব বক্তব্য হুবহু দেয়া আছে ওয়েবসাইটগুলোতে। অবাক করার বিষয় হলো, শতকরা প্রায় আটানব্বই ভাগ পুরুষ বলেছেন তারা মেয়েদের চুলভর্তি বগল পছন্দ করেন। অধিকাংশই মেয়েদের বগলের ঘ্রাণকে পৃথিবীর যে কোনো পারফিউমের চেয়ে আকর্ষণীয় বলেছন এবং সেখানে চুম্বনকে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করেছেন।

ফাহিম সিএনএন-এর একটি ওয়েবসাইট থেকে দেখালো স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক মিলনের সময় স্ত্রীর বগলে চুম্বন লেহন করে স্ত্রীকে চূড়ান্ত তৃপ্তি দেয়া সম্ভব। প্রতিটি ওয়েবসাইটেই মেয়েদের বগলের চুলের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

হাপ ছেড়ে বাচলাম। তাহলে পুরুষের সহজাত বৈশিষ্ট অনুযায়ী নাবিহার বগল দেখে পাগল হয়েছি। হয়তো প্রথমবার দেখার কারণে আমার প্রতিক্রিয়া একটু বেশি হয়েছে।

ফাহিমকে ধন্যবাদ দিয়ে হলে ফিরে আসি। বিছানায় শুয়ে পড়ি। আমার মধ্যে শুধু নাবিহা আর নাবিহা। বুঝলাম এবার খালাতো বোনের প্রেমে পড়েছি। সুত্রপাত যেভাবে হোক না কেন আমি তাকে ভালোবেসে ফেলেছি এটাই শেষ কথা। কিন্তু আমি তো তার পেছনে আরেজকে লেলিয়ে দিয়েছিলাম। স্বার্থপরের তো তার প্রেম ভিক্ষা চাইবো? কিচ্ছু ঢোকে না মাথায়। শুধু ঢোকে একটা শব্দ নাবিহা। সে ছাড়া আমার বেচে থাকার কোনো অর্থ নেই।

বিকেলে নাবিহার হলে গিয়ে চিরকুট দিয়ে তাকে ডাকাই। তবে আমার নাম না লিখে অপরিচিত একটা নাম লিখি। নাবিহা গেটে এসে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে এবং কলকারীকে খুজতে থাকে।

তার পেছনে গিয়ে *এক্সকিউজ মি* বলে তাকে আমার সাথে ডাকি।

নাবিহা যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। রোবটের মতো সে আমাকে ফলো করে। লাইব্রেরির বারান্দায় এক কোণে গিয়ে বসি দুজন।

ডেকেছো কেন? নাবিহাই নীরবতা ভাঙে।

তুমি ছিলে আমার চোখের বালি। কিন্তু আমার চোখ হতে গতকাল বালি বের করতে গেলে কেন তুমি?

ক্লাস সিক্সের পর এই প্রথম আলাপ দুজনের। কেউই স্বাভাবিক হতে পারছিলাম না। তবুও নাবিহা স্বাভাবিক থাকার ভান করে।

তো কি অপরাধ করেছি তাতে? তার চোখে কৌতূহল।

অপরাধ তুমি করোনি। আমাকে অপরাধে প্ররোচিত করেছো। আমি আর পারছি না নাবিহা। সত্যি করে বলছি আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। তোমাকে ছাড়া আমি বাচবো না, বাচতে চাই না। তোমাকে এখনই এ কথার জবাব দিয়ে যেতে হবে। না হলে সকালের পেপারেই আমার মৃত্যু সংবাদ পাবে। এক দমেই কথাগুলো আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যায় এবং আমি তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে শুধু বলি, *প্লিজ।*

কোনো অপরাধে আমি আরেজকে ছাড়বো? আমি তো তাকে ভালোবাসি সেই স্কুল জীবন থেকে। শান্ত কণ্ঠে সে বলে।

নাবিহার মুখ থেকে আরেজকে ভালোবাসি কথাটা শুনেই মনে হলো আমার বেচে থাকার কোনো অর্থ নেই। ভাবাবেগ আমাকে এমন পাগল করে তুলেছে যে, আমার অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎ কোনো কিছুই ভাবতে ভালো লাগে না। জীবনে প্রথমবারের মতো প্রেমে পড়ে এতোটা মাতাল হবো ভাবতে পারিনি। চিৎকার করে শুধু নাবিহাকে ডাকতে ইচ্ছে করছিল। মনে হলো তাকে ছাড়া আমার শ্বাস নেয়ার কোনো অর্থ নেই।

কিছু না বলে উঠে সোজা নীলক্ষেত চলে যাই। খোজ করি ঘুমের ওষুধ। কিন্তু দোকানদার কিছুতেই দেবে না। বহু কষ্টে তাকে ম্যানেজ করে পাচটি বড়ি এনে নাবিহার উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে রুমমেটদের অগোচরে খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। আত্মহত্যাকেই উপসংহার মেনে নেই।

বুঝলাম আমাতে যমেরও অরুচি হয়েছে। মরলাম না। চোখ খোলার পর আশেপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারি আমি হাসপাতালে। কপালের ওপর রাখা হাতটা কার তা দেখার জন্য পাশ ফিরে তাকাতেই নাবিহা ঝাড়ির সুরে বলে ওঠে, You are a stupid. I hate you. I hate you!

নাবিহার হাত ধরে তার মুখের দিকে তাকাই। তার দু চোকের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে স্রোতধারা। তার চোখের ভাষাই আমাকে জানিয়ে দিল – She does not hate me. She loves me too!

ঢাকা থেকে
shahed_0172@yahoo.com

সূর্যদা

– কালকেতু

সূর্যদারা ঠিক কবে আমাদের পাশের বাড়িতে এসেছিলেন তা আর আজ মনে নেই। শুধু মনে আছে, একদিন বিকেলে একটি রোগা, পাতলা ছেলে শাদা থান পরিহিতা এক মহিলার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। মা, চাচিদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব শেষ হতেই মহিলা সঙ্গের ছেলেটিকে বলেছিলেন, বাবা সূর্য, ওনাদের প্রণাম কর।

মেজচাচি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি বাবা?

সূর্যদীপ্ত।

তারপর এক কোণে দাড়িয়ে থাকা আমাকে দেখে সূর্যদার পিসি বললেন, সূর্য, আমি ওনাদের সঙ্গে একটু গল্প করি, তুমি বরং অনুর সঙ্গে খেল। আজ থেকে ও তোমার খেলার সঙ্গী হয়ে গেল।

কিন্তু এ খেলার সঙ্গীকেই সে যে একদিন জীবন সঙ্গী হিসেবে চেয়ে বসবে তা হয়তো তিনি তখন ক্ষুণাক্ষরেও কল্পনা করেননি।

এরপর থেকে এক সময় সূর্যদার পিসি আমারও পিসি হয়ে গেলেন। তার মা ও বাবাকে আমি কাকি ও কাকু বলে ডাকতে শুরু করলাম। দেখা গেল প্রায় দুপুরে পিসির পাশে কে ঘুমাবে সেটা নিয়ে ঝগড়া বেধে যেতো।

শেষ পর্যন্ত একপাশে আমি আর অন্যপাশে অভীক জায়গা পেতো। আর সূর্যদাকে থাকতে হতো অভীকের (সূর্যদার ছোট ভাই) পাশে।

ওই বাড়িতে আমি ছিলাম তাদের মেয়ের মতো। সেই বয়সটায় কেউ আমাকে নিষেধ করেনি ও বাড়িতে যেতে। আমি যখন ইচ্ছা ও বাড়িতে যেতাম, খেলতাম, অভীককে জ্বালাতাম আর সূর্যদার কাছে পড়তাম। শৈশবের স্মৃতি হাতড়ালে এখনো যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে হয় পিসির আচল ধরে টানছি, না হলে বাইরে রাখা কাকির শাড়ি পরার জন্য বায়না করছি। আমাকে এতো আদর করতো ওরা! কিন্তু তারপরেও পূজোর সময় আমাকে দূরে সরিয়ে রাখা হতো। শুধু তখনি বুঝতাম আমাদের মধ্যে ধর্মের পার্থক্যটা।

পহেলা বৈশাখে আমাদের বাড়ির ছাদে আমরা সব চাচাতো ভাইবোন আর সূর্যদা ও অভীক মিলে পিকনিক করতাম। কি যে আনন্দময় ছিল সেই দিনগুলো! এর মধ্যেই আমরা সবাই বড় হয়ে উঠছিলাম। ঝগড়া, মায়া–মমতা, বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে দিনগুলো কাটছিল।

এর মধ্যেই একদিন ভাইফোটার দিন এসে গেল। কাকি আগের দিন এসে বলে গেছেন সূর্যদার কোনো চাচাতো ফুপাতো বোনেরাই এবার আসেনি, এদিকে অভীক খুব জেদ ধরেছে ভাইফোটা দেয়ার জন্য। তাই আমি যেন এবার সূর্যদা অভীককে ভাইফোটা দিয়ে আসি।

মা, চাচিরা প্রথমে নাক সিটকালেও পরে আর কিছু বললেন না।

রাতে আব্বা শুনে বললেন, ঠিক আছে। যেও। এ কথা শুনে চাচাত ভাইবোনদের দিকে এমন ভাবে তাকাতে শুরু করলাম যেন ভাবখানা এমন, দেখেছিস দুই বাড়িতে আমার কতো কদর!

মেজচাচির ছেলে সুমন তো রেগে গিয়ে বলেই বসলো, ভাইফোটা দিলে তো তুই হিন্দুর বোন হয়ে যাবি। ছিঃ।

পরের দিন খুব সকালে দেখি সূর্যদা আমাদের বাড়িতে হাজির। মুখটা গম্ভীর। আমাকে বাড়ির এক কোণায় নিয়ে গিয়ে বললেন, আজকে তুই আমাকে ভাইফোটা দিবি না।

কেন?

আমি বললাম, দিবি না। ব্যস দিবি না।

তাহলে যে আমি চুড়ি, দুল কিছুই পাবো না।

সূর্যদা রেগে দিয়ে বলেছিলেন, তুই তো খুব লোভী রে অনু। আচ্ছা যা, ওগুলোও পাবি। কিন্তু তুই শুধু আমাকে ভাইফোটা দিবি না। এ কথা বলেই তিনি দৌড়ে পালালেন।

সেদিন ভাইফোটা দেয়ার সময় সূর্যদাকে পাওয়া গেল না। আমি ক্ষুণ্নমনে অভীকেই ভাইফোটা দিলাম।

অভীক আমাকে চুলে দেয়ার ক্লিপ, দুল আর সূর্যদার দেয়া চুড়ি দিল।

সেগুলো নিয়ে মহা আনন্দে বাড়ি ফিরলাম। সেদিন না বুঝলেও এখন বুঝি কেন সেদিন সূর্যদা আমাকে ভাইফোটা দিতে দেননি।

সূর্যদা আমার প্রতি তার দুর্বলতার কথা জানিয়েছিলেন অনেক পরে। তিনি তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়েন আর আমার সামনে এসএসসি পরীক্ষা।

এর মধ্যে একদিন সূর্যদার একটা চিঠি পেলাম। আবেগময় ভাষায় তিনি জানিয়েছেন তার ভালোবাসার কথা। এও জানালেন, এর পরিণামও তিনি জানেন।

চিঠির উত্তর দিলাম না। কারণ জানতাম, এটা কখনোই হবার নয়। যদিও সূর্যদার প্রতি ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। সারাদিন অপেক্ষা করতাম কখন ওকে একবার দেখবো। ওর সঙ্গে একটু কথা বলবো। আমি এর পরিণতি জানতাম। তাই ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লেও নিজেকে ওর কাছ থেকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখতে শুরু করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলাম না।

এর মধ্যেই একদিন আমার চাচাতো ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হলো। বিয়ের আগের দিন রাতে আমরা সবাই মিলে বাসরঘর সাজাচ্ছি। হঠাৎ করে সূর্যদা আমাকে বললো, অনু, একটু আমার সঙ্গে আয়তো। ও আমাকে ছাদের চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে গেল।

ওর দিকে তাকাতেই ও হঠাৎ আমার হাত ধরে বললো, তোকে আমি ভালোবাসি অনু। তোকে ছাড়া আমি অন্য কিছু ভাবতে পারছি না। প্লিজ, তুই আমাকে ফিরিয়ে দিস না।

তখন কিছুই বলতে পারছিলাম না শুধু সম্মোহিতের মতো তাকিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমার এতো দিনের সব সংযম, সংস্কার ভেঙে যাচ্ছে।

কিন্তু সূর্যদা...।

কিন্তু কথাটা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারলাম না। যখন সংবিৎ ফিরে পেলাম তখন সূর্যদার ঠোঁট আমার ঠোঁটে। আমার সমস্ত শরীরে এক আশ্চর্য ঝনঝনানির শব্দ শুনলাম যার সাথে আমার আগে পরিচয় হয়নি। গভীর আবেশে সূর্যদাকে জড়িয়ে ধরলাম। ততোক্ষণে ওর অবাধ্য ঠোঁট আমার বুকে। হঠাৎ নিচে কিছুর শব্দ হতেই আমরা নিচে নেমে এলাম। এভাবেই অকূল সমুদ্রে ভালোবাসার তরী ভাসালাম আমরা।

এরপর দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে গেল। ও এইচএসসি–তে ভালো না করলেও মেডিকালে চান্স পেল। ওর রেজাল্টের পরদিন যখন আমরা পদ্মার ধারে দেখা করেছিলাম, ও বলেছিল, তুই পাশে থাকলে আমি সব বাধাই জয় করতে পারবো। তারপর রহস্য করে বললো, এতো বড় একটা কাজ করলাম। কিন্তু উপহার তো পেলাম না।

ভীষণ লজ্জা লাগলো। যখন চলে আসছিলাম তখন চারদিকে আবছা অন্ধকার। সুযোগ পেয়েই ওকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো আদর করতে শুরু করলাম। হুশ হতেই বাড়ির দিকে দৌড় দিলাম।

এর পরের বছর ছুটি পেয়ে বাড়িতে এলো। সামনে পরীক্ষা। পড়াশোনার ভীষণ চাপ। আর আমাকে বই নেয়ার ছলে ওর কাছে হাজিরা দিতে হয়।

একদিন ও বাড়িতে যেতেই কাকি বললেন, অনু, দুধের গ্লাসটা তোর সূর্যদার ঘরে দিয়ে আয়তো।

ওর টেবিলে গ্লাসটা রেখে চলে আসতে চাইতেই ও এক হাত দিয়ে আমাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরলো।

এমন সময়ে পেছনে কারো পায়ের শব্দে ছিটকে সরে দাড়ালাম। দেখি আমাদের পেছনে সূর্যদার মা এসে দাড়িয়েছেন।

আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সূর্যদাকে শুধু বললেন, তোর এতো বড় অধঃপতন। স্থির কণ্ঠে বললেন, অনু, তুমি তোমার বাড়িতে যাও।

কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে বাড়িতে ফিরে এলাম। হচ্ছিল সব দুঃস্বপ্ন। জেগে উঠলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে কি এই সামান্য ভুলের জন্য আমাদের সব স্বপ্ন, সব পরিকল্পনা বৃথা যেতে বসেছে!

সন্ধ্যার কিছু আগে পিসি এলেন আমাদের বাড়িতে। কি বললেন, জানি না।

কিন্তু বড় চাচি হঠাৎ চেচিয়ে উঠলেন, *এক্ষুণি বেড়িয়ে যান এ বাড়ি থেকে।*

আমার মা ছুটে এসে আমার চুলের মুঠি ধরে ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগলেন, বংশের মুখে কালি দেয়ার আগে তোর মরণ হলো না কেন। তারপর বিছানায় আছড়ে পড়ে ডুকরে কেদে উঠলেন।

বাবা চোখ মুখ অন্ধকার করে বাড়ি ফিরলেন। চাচারা গম্ভীর।

বড় চাচার ঘরে আমার ডাক পড়লো। ঘরে যেতেই বাবা ক্রোধ উন্মত্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, *ওই হিন্দু ছেলের সঙ্গে তোর কিসের সম্পর্ক?* তারপর আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঘরের কোণে রাখা খেলার ব্যাট দিয়ে এলোপাথারি মারতে শুরু করলেন । তীব্র ব্যথায় জ্ঞান হারানোর আগে শুধু দেখলাম বাবা আমার মাকে মাটিতে ফেলে ক্রমাগত লাথি মারছেন।

এর পরের ঘটনা লিখতে গিয়ে আমার কলম আর চলছে না। শুধু এটুকুই জানাচ্ছি, আমার মা মারা যান ১১ শ্রাবণ। আমার মরণাপন্ন মায়ের মুখে যে হতাশা আর যন্ত্রণার ছাপ দেখেছিলাম তা কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

আমার মরণাপন্ন মাকে কথা দিয়েছিলাম, সূর্যদার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না। আমার বাবা আর ছোট দুই বোনকে দেখবো।

আমার মায়ের কথা রেখেছি। একজনের ভালোবাসার প্রতিদান স্বরূপ আরেকজনের ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়েছি।

সূর্যদাকে শেষবার দেখেছিলাম সাত বছর পর এক অনুষ্ঠানে। তার পাশে হাসিমুখে দাড়িয়ে আছে তার স্ত্রী ও সন্তান। খুব ইচ্ছা করছিল সূর্যদাকে একবার ডাকি। কিন্তু ডাকতে পারিনি। কারণ আমি যে এখনো তাকে ভালোবাসি।

রাজশাহী থেকে

নিখোঁজ

- এম এম রহমান

ডেমোক্রেসিওয়াচ।

আমার কমপিউটার জীবনের প্রথম হাতেখড়ি এখান থেকেই। ১৯৯৯ সালের জুন জুলাই মাস হবে। কমপিউটার বেসিক কোর্স করার জন্য অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান ঘুরলাম। কিন্তু কোনোটাই পছন্দ হচ্ছিল না। ঘুরতে ঘুরতেই পেয়ে গেলাম ডেমোক্রসিওয়াচকে। সার্কিট হাউস রোডের অপূর্ব লোকেশনে এর অবস্থান। শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও এটি ছিল যাবতীয় কোলাহল ও দূষণমুক্ত। এর সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, ঘনসবুজের সমারোহ, অপূর্ব বৃক্ষরাজি আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করলো। সিদ্ধান্ত নিলাম এবং খুব দ্রুত ভর্তি হলাম *বেসিক কমপিউটার অ্যান্ড ইংলিশ স্পোকেন কোর্সে*।

চব্বিশজন স্টুডেন্ট মিলে একটা ব্যাচ ছিল। এদের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে আবার দুভাগে ভাগ করা হলো। আমার দলের নাম ছিল 24A2 ব্যাচ। প্রত্যেক ব্যাচে বারোজন করে স্টুডেন্ট। প্রতিষ্ঠানটি কোনো নতুন কারিকুলাম হাতে নেয়ার আগে স্টুডেন্টদের মতামত নিতো যা আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কখনোই খুব ভালো ছাত্র ছিলাম না, একা থাকতাম তাই হাতেগোনা কয়েকজনের সঙ্গে মিশতাম।

এভাবেই ধীরে ধীরে পরিচয় হতে থাকে কমপিউটার ক্লাসের মঞ্জুভাই, ট্রপি, রুচিআপার সঙ্গে এবং স্পোকেন ক্লাসের সোমার যার তখনই এক আমেরিকান পাত্রের সঙ্গে এনগেজমেন্ট হয়ে ছিল, আমেরিকা যাবে, সেই উদ্দেশ্যেই স্পোকেন করতে আসা তার সঙ্গে।

মঞ্জুভাইয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা একটু বেশি ছিল। হয়তো দুজনই দাবা খেলাটিকে খুব পছন্দ করতাম বলে। ডেমোক্রেসিওয়াচ ছাড়ার পরও মঞ্জুভাইয়ের সঙ্গে বেশ কিছু দিন যোগাযোগ ছিল। দুই একদিন আমার বাসায়ও এসেছিলেন। তারপর হঠাৎই যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল।

যেদিন আমাদের বিকেলে কোনো ক্লাস থাকতো সেদিন আমাদেরকে প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানে থাকতে হতো। যেহেতু আমার বন্ধু সংখ্যা ছিল হাতেগোনা সেহেতু ক্লাসের আগ পর্যন্ত সময় কাটানো ছিল আমার পক্ষে বেশ কঠিন।

প্রায় দুপুরই আমাকে একা কাটাতে হতো। এমনই এক দুপুরে একা ডেমোক্রেসিওয়াচ–এর বারান্দায় (যাকে আমরা ক্যাম্পাস বলতাম) বসে আছি, সময় কিছুতেই কাটিছিল না। হঠাৎ আমার সামনে পিরিচে দুটো সিংগারা দেখতে পেলাম এবং শুনলাম, খাও!

চেহারা দেখার আগে দেখলাম ও চলে গেল এবং মিনিট পরেই ফিরে এলো হাতে আরেকটি পিরিচ ও দুটো কোল্ড ড্রিংকস। তারপর পরিচয়।

জানতে পারলাম ওর নাম সোমা। ও শুধু কম্পিউটার কোর্সই করতে এসেছিল।

কিছুক্ষণ পর আরো একটি মেয়ে এসে যোগ দিল নাম রূপা। দেখতে একটু মোটা হলেও মনটা অসম্ভব ভালো। ধরে নিয়েছিলাম তারা দুই বান্ধবী।

এরপর থেকে আমরা তিনজন খুব ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম। ক্লাসে আমরা এক সঙ্গে বসতাম এবং ক্লাসের স্থলে আমরা (আমি আর সোমা) টিচারকে ফাকি দিয়ে প্রায়ই খাতায় কাটাকাটি খেলতাম। এভাবেই আমাদের বন্ধুত্ব খুব মসৃণ গতিতে চলছিল।

তিনটি মাস কিভাবে যে, চলে গেল টেরই পেলাম না। ক্লাস শেষ। আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম বিদায়লগ্নে একটি পার্টির আয়োজন করবো।

দিন ঠিক করে যার যার কাজ ভাগ করে দেয়া হলো। নির্দিষ্ট দিনে সবাই চলে এলো। এদিন সোমাকে অন্য রূপে দেখলাম। ও সব সময় খুব নরমালভাবে চলতো, সুন্দরী বলে বেশ ভালোই লাগতো। কিন্তু আজ দেখলাম ও আরো সুন্দর। আজ সাজতে কোনো কার্পণ্য করেনি। মনে হলো ও এ ভুবনে নয়, অন্য ভুবনে তার বসবাস। ভুলক্রমে এ কুৎসিত পৃথিবীতে চলে এসেছে।

কয়েক সেকেন্ড কোনো কথা বলতে পারিনি। তারপর ও যখন আমার পাশের চেয়ারটিতে বসলো, আমাকে মনে হলো পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি। পুলকিত আমার সর্বাঙ্গ।

একটি গাড়ি এলো। একে একে নামলো রূপা এবং তার সঙ্গে দুটি বাচ্চা। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। রূপা পরিচয় করে দিল তার দুই ছেলেমেয়ের সঙ্গে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাচ্চা দুটির সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল।

বুঝতে পারিনি আজ এতো বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। এতো দিন পর আজই প্রথম জানতে পারলাম রূপা সোমার ফুপু এবং রূপা অনেক আগেই এমএম শেষ করেছে অর্থাৎ আমাদের অনেক সিনিয়র।

প্রথম পরিচয় থেকেই তাকে তুমি বলে ডাকতাম। কিন্তু আজ যখন জেনেছি ও সিনিয়র তখন না পারছি তুমি বলতে, না পারছি আপনি বলতে। আমি তখন উভয় সঙ্কটে।

এদিন আমরা সবাই মিলে খুব আনন্দ করলাম।

একজন গিটারিস্ট গিটার বাজিয়ে শোনালো।

এপর এলো শেষ বিদায়ের মুহূর্ত। আজ সবাই সবার থেকে বিদায় নেবে। সবার মধ্যে সবাই ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার বিনিময় করছে ভবিষ্যতে যোগাযোগের আশায়।

বিদায়ের আগে আমাদের স্পোকেন টিচার সৈয়দ মাহজারুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে কিছু ছবি তুললেন। তারপর তিনি হঠাৎ আমাকে ডেকে একটি কাগজে তার ঠিকানা দিয়ে বললেন, তোমার যখনই কোনো দরকার হবে তখনই ঠিক আমার বাসায় চলে যাবে।

অনেকে আড়চোখে দেখলেও কেউ কিছু বলেনি। এরপর হঠাৎ সোমা কোথা থেকে যেন দৌড়ে এলো এবং একটি নাম্বার দিয়ে বললো, ফোন করো।

তার বলার ভঙ্গিতে আমার খুব খারাপ লাগছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, আমি যেন কি হারাচ্ছি। ইচ্ছে হচ্ছিল সোমাকে নিয়ে আজ সারা দিন রিকশায় ঘুরি। কিন্তু লজ্জার কারণে তা বলতে পারিনি। শুধু বললাম, আচ্ছা!

এরপর বহুবার সোমার দেয়া নাম্বারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, পারিনি। প্রতি ১৪ ফেব্রুয়ারিতে প্রচণ্ডভাবে সোমাকে মনে পড়ে আর ভালোবাসার বাতাসে একটি প্রশ্ন ছড়িয়ে দিই, *সোমা তুমি কোথায়?*

ঠিকানা বিহীন

mm_r138@yahoo.com

অবুঝ মনের সবুজ আশা

মাবুদ আল্লাহ, আজ প্রায় তিন বছর হতে চললো, আমার স্বামী তোমার কাছে। মাবুদ, কোনো খোজ খবর পাই না। হাল-হকিকত জানতেও পারি না, জানাতেও পারি না। মনটা বড্ড পেরেশান থাকে। তোমার কাছে এ চিঠি কিভাবে পৌছাবে আমি জানি না। তারপরও লিখলাম। মানুষ জানতে পারলে আমাকে পাগল ঠাওরাবে। কিন্তু এই মনটা তো কোনো নিয়ম-কানুন মানতে চায় না। আমি জানি, সুমন তোমার কাছে আছে, তাই তোমাকেই লিখলাম। পৌছানোর দায়িত্ব তোমার।

মাবুদ আল্লাহ, ওর দিকে একটু খেয়াল রেখো। এটু বেশি করে খেয়াল রেখো। ও কিন্তু খুব চাপা স্বভাবের। নিজে হাজারো সমস্যায় থাকবে। কিন্তু কোনোদিন বলবে না। ইলিশ-খিচুড়ি রান্না করে যদি শুধু খিচুড়ি দিই, ইলিশ মাছ না দিই, তাও কিছু বলবে না। চুপচাপ খেয়ে উঠবে। কখনো খাওয়া দাওয়া নিয়ে কোনো হই চই করবে না। আর মাবুদ আল্লাহ, খাবার সময় ওকে একটা লেবু কেটে দিও। ও লেবু ছাড়া ভাত খেতে পারে না। ঈদের সময় একটু ঝুরা মাংস দিও। ঝুরা মাংস খেতে ও খুব পছন্দ করে।

মাবুদ আল্লাহ, আর কয়েকদিন পর মোবাইলের দাম আরো কমবে। তখন ওকে একটা মোবাইল কিনে দিও। চোখে না দেখি, কমসে কম ওর গলা তো শুনতে পাবো। কতোদিন ওর সঙ্গে কথা বলি না। কতোদিন এ চোখ দুটো ওকে দেখে না।

একবার কি হলো! বিয়ের আগে ও আমার মোবাইলে একটা খুব সুন্দর মেসেজ পাঠালো আকাশ আর চাদ নিয়ে। খুবই সুন্দর একটা মেসেজ। পড়তেই আমার চোখে পানি এসে গেল। কিন্তু দুই দিন পরেই আবার কাদতে হলো যখন শুনলাম ও মেসেজটা আরো কয়েকটা ফ্রেন্ডকে পাঠিয়েছে। আমি এবং অন্য সব ফ্রেন্ড কি এক হলো! ফলাফল বিকট ঝগড়া। কিন্তু মন খারাপ হলে বা ঝগড়া হলে কখনো কথা বলি না। ও যা বোঝার বুঝে নেয়। পাশে এসে বসে। আমার হাত ধরে। আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে নরম সুরে আমাকে বোঝায়। ব্যস, দশ মিনিটেই আমার রাগ উধাও। আমার মুখে আবার বসন্তের ফুল ফোটে। এর দুই দিন পরে ও আরেকটা মেসেজ পাঠালো।

যখন আমি আমার ওয়ালেট খুলি তখন তা শূন্য পাই। পকেট হাতড়ে খুজে পাই সামান্য কিছু কয়েন। যখন হৃদয়ে খোজ করি তখন পাই তোমাকে। বুঝি কতোটা ধনী আমি! সুন্দর এক সময়ে আমি এসেছি।

-সুমন

আচ্ছা, এই মেসেজ দেখে কেউ ঠিক থাকতে পারে? আনন্দে চোখে পানি এসে গেল। রাতে শুয়ে দুঃখ ভরা আনন্দে কাদলাম। মানুষটা আমাকে এতো ভালোবাসে! মাবুদ আল্লাহ। তবে এতো বড় আনন্দ, এ যে কতো বড় তৃপ্তি বোঝাতে পারবো না। ও কোনোদিন মুখে ভালোবাসার কথা বলে না। শুধু তাকিয়ে থাকে, চোখ দিয়ে কথা বলে।

মাবুদ গো, ওর জন্য একটা টিভি কিনে দিও। তোমার তো অনেক টাকা, আর ইলেকট্রক বিল দেওয়ারও কোনো ঝামেলা নেই, লোডশেডিংয়ের কোনো প্রবলেম নেই। ও ইনডিয়ার খেলা খুব পছন্দ করে। ইনডিয়ার খেলা হলে কোনো কথা নেই। অফিস-আদালত ফেলে সোজা বাসায় বসে খেলা দেখবে এবং আমাকে বলবে নামাক পারা ভেজে দিতে। খেলা দেখা আর নামাক পারা-তে ওর খুব সুন্দর সময় কাটে।

আচ্ছা, তোমার ওখানে কি বেশি শীত পড়ে? তাহলে ওর জন্য ভালো দেখে সোয়েটার মাফলার কিনে দিও। আমি পারলে ওর জন্য বুনেই দিতাম। তা আর হলো কোথায়? ও তো সবাইকে ফাকি দিয়ে চলে গেল। অন্য সবার মতো আমিও যদি ওকে ভুলতে পারতাম তবে বেচে যেতাম। অবশ্য বাচতে কি আমি চাই?

আমরা যে বাসায় থাকতাম সে বাসায় এখন অন্য লোক থাকে। মাবুদ আল্লাহ, আমার যদি টাকা থাকতো তবে ওই বাসাটা ভাড়া রেখে দিতাম। আসবাবপত্র যেখানে যা ছিল তেমন থাকতো। মাসে দুই একবার তালা খুলে যেতাম ওঘরে। ঘরটা দেখে মনে হতো সব তো আগের মতোই আছে। ও হয়তো পাশের রুমে ঘুমাচ্ছে বা বাথরুমে শেভ করছে। কিন্তু কোথায় সুমন? সারা ঘরে কোথাও তো ওকে পাবো না। বিছানায় যে পাশে, যে বালিশে মাথা রেখে ও ঘুমাতো সে বালিশটা বুকে রেখে চেপে ধরতাম। দুই চোখে বয়ে যেতো যমুনা ও মেঘনা।

জানো মাবুদ আল্লাহ, রাতে ঘুমানোর সময় ওর সবুজ মাফলারটা পাশে রেখে ঘুমাই। ওতে এখনো ওর মাথার গন্ধ লেগে আছে যে, মাবুদ আল্লাহ, *ভালোবাসার দিনটা* আসলেই ওর কথা খুব বেশি করে মনে পড়ে। কেননা এদিনের তিন দিন আগেই তো পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে ও চিরতরে চলে গেল আমায় একা ফেলে। কিন্তু সুমন, আত্মা তো অবিনশ্বর, তাকে কি দিয়ে ঠেকাবো? আমার আত্মা তোমার আত্মাকে ভালোবাসে। যেদিন এই আত্মা শরীরের মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে সেদিন আবার তোমাকে পাবো এ আমার বিশ্বাস।

মাবুদ আল্লাহ, তোমার কাছে আমার শুধু একটাই চাওয়া। মাবুদ আল্লাহ, এই জনমে, মৃত্যুর পরের জীবনে, সব জীবনে যেন সুমনকে পাই। আমার কপালে আর কিছু না রেখো, শুধু সুমনের ভালোবাসা রেখো, ওর কাছ থেকে আমাকে আলাদা করো না। এ জীবন কতোদিনের, বড়জোর ত্রিশ–চল্লিশটা বছর। যে চাকরিটা করছি তাতেই আমার দিব্যি চলে যাবে। আমাকে নিয়ে সুমন তুমি কোনো চিন্তা করো না। শুধু একটু কষ্ট করে অপেক্ষা করো আমার জন্য।

মাবুদ আল্লাহ, ওর ছবিগুলোই আমার শেষ সম্বল। ওগুলোকে যত্ন করে উঠিয়ে রেখেছি। মাঝে মধ্যে একটু বের করে দেখি। আর কি বা করতে পারি বলো?

সুমন, তোমাকে একটু বলি। তোমার কোনো সমস্যা হলে তুমি আল্লাহকে বলবে। যেকোনো সমস্যা হোক না কেন, তুমি বলবে। আমি ভালো আছি। আর কখনো ভুলো না, বিদায়। কখনো গুডবাই বলো না। কারণ জীবন কান্নার জন্য নয়। সুমন চিঠি দিও। তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

নিরহংকারী

– মঞ্জু

এই অত্যাধুনিক যান্ত্রিক পৃথিবীতে মানুষ চলে যন্ত্রের মতো, কথা বলে হিসাব করে, থাকে তার গণ্ডির মধ্যে নিজেকে নিয়ে আর ভালোবাসা? সেটা যদি হয় তাহলে তার একান্তই ব্যক্তিগত কারণে। তাই কোনো একদিন হয়তো ভালোবাসা মাপার যন্ত্র বের হয়ে যাবে জ্বর মাপার মতো। মানুষ যেন মুখ দিয়ে বলেই ভালোবাসাকে উপলব্ধি করতে চায় কিংবা কোনো উপহার বা অন্য কিছুর দ্বারা। এখন কেউ বুঝতেই চায় না এক টুকরো নির্মল হাসি কিংবা সুন্দর ব্যবহার যে কোনো উপহারের চেয়ে হাজার গুণ বেশি প্রয়োজনীয় যা আসে মানুষের সুন্দর–স্বচ্ছ মন থেকে। তখনই সম্ভব যখন সম্পর্কটা হয় ভালোবাসার।

আজ সেই ভালোবাসারই সন্ধান করছি যা অনেক দিন ধরে পাই না, যার অভাব সারাক্ষণ অনুভব করি। সে আর কেউ নয়, তিনি আমার বাবা। গ্রীষ্মের গরমে তার পাশে কখনো ঘুমালে রাতে তার হাতে পাখাটা অবিরাম চলতো, এমনকি গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙলেও দেখতাম যে, ঘুমের মধ্যেও তার হাত পাখাটা নেড়েই চলেছেন। আজ হঠাৎ ঘুম ভাঙলে অন্ধকার ঘরে ভয় করতে থাকে। তাকে দেখেছি, আদরের নাতি–নাতনিদের দেখার জন্য ছুটে যেতেন, এক পলক দেখে আবার চলে আসতেন।

এতে তার কোনো অহংকার ছিল না, বরং ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা যার টানে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। তিনি আমাদের সভ্য সমাজকে বুঝিয়েছেন যে, একজন মানুষের প্রয়োজন অন্যদের ভালোবাসা এবং তাকেও অন্যদেরকে ভালোবাসতে হবে তার মনের সংকীর্ণতার উৎপাটন ও উদারতা বৃদ্ধির জন্য। এসব তার মৌখিক ছিল না, ছিল তার আচার-আচরণের বহিঃপ্রকাশ।

বাবা, তোমার মতো মানুষের আজ খুব অভাব অন্তত আমার জীবনে। বাবা, আই মিস ইউ ভেরি মাচ।

টুলোস, ফ্রান্স থেকে
manju@ureach.com

সতীত্ব

আমি একজন ধর্ষিতা কিংবা নষ্টাও বলা যায়। কি জানি কেন ভালোবাসতে গিয়ে এমনটি হলো, এ কি ভালোবাসার পুরস্কার! নাকি ঈশ্বরের শাস্তি?

আমি আমার পরিবারের সবার ভীষণ আদরের। তাদেরকে ঠকিয়ে ওকে ভালোবাসা তো এমন পুরস্কার দেবেই। ধরা যাক, ওর নাম জুয়েল।

আমাদের সম্পর্কটা ওর দিক থেকেই। সেদিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে যেদিন ও আমাকে ভালোবাসার কথা বলেছিল।

জুয়েলের চেহারাটা আহামরি না হলেও যেখানে অদ্ভুত একটা মায়া ছিল। নিষ্পাপ এক শিশুর মতো।কথাও বলতো একদম সহজ সরলভাবে।

ধীরে ধীরে ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি। ঠিক মাদকাসক্তের মতো। জানি না কেন এই ভুলটি করলাম। অনেক কিছুই জানি না। শুধু এটুকু জানি, আমি আমার ভালোবাসার দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছি।

জুয়েল ছিল খুব বদমেজাজি একটা ছেলে। এই আমাকে বকতো আবার এই আদরে বুকে টেনে নিতো।

ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম ওর নিষ্ঠুরতায়।

সম্পর্কের একটা পর্যায়ে দেখলাম ও আমার মনটাকে ছুতে চায় না, চায় এ শরীরকে। ওর চোখ দুটির আড়ালে এতো কুৎসিত একটা চাহিদা থাকতে পারে ভাবাই যায় না! সব বুঝেও কেন জানি নিজেকে ওর থেকে আলাদা করতে পারছিলাম না। কারণ ওকে যে অনেক ভালোবাসি।

১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস সেদিনটি আমার সবচেয়ে কষ্টের দিন। জুয়েলের নিষ্ঠুরতা নোংরামি দেখে এক সময় প্রতিজ্ঞা করি, আর যাবো না ওর কাছে।

কিন্তু ও খুব চাপ দিচ্ছিল যেন আমি যাই একদিন।

ভেবেছিলাম কি আর এমন হবে! মনটাকে শক্ত রাখলেই সব ঠিক থাকবে। পারিনি আমি। মনের জোর একজন পুরুষের শরীরের জোরের সঙ্গে পারেনি।

খুব ভোরে ওকে ঘুম থেকে জাগালাম। তারপর...।

ওর চাওয়াটা বুঝলাম। অনুরোধ করলাম, ভালোবাসার কসম দিলাম। বললাম, চিৎকার দেবো। কোনো লাভ হলো না।

ও বললো, একটা মুহূর্তের জন্যও যদি আমাকে ভালোবাসো তবে আমার কাজে বাধা দিও না।

তবুও দিলাম। শেষ শক্তিটুকু দিয়েছিলাম। লাভ হলো না।

গিয়েছিলাম ভালোবাসা দিবসে ভালোবাসা জানাতে ফিরে এলাম নষ্ট হয়ে। আমার সতীত্বকে বিসর্জন দিয়ে ভালোবাসার দাম দিলাম। আমার রক্ত দিয়ে সেদিন লিখেছিলাম আমার প্রেমের উপাখ্যান। জানি না প্রতিটা মেয়ের বাসর রাত সুখের হয় কি না? কিন্তু আমার বাসর (?) কেটেছে এক অমানবিক কষ্টে। চাপা কান্না ছাড়া আর কিছুই করতে পারিনি। কি অদ্ভুত একটা ভালোবাসা দিবস কাটালাম।

আসার সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কি প্রশান্তি ছিল তাতে। খুব কঠিন ভাষায় বললো, আমার এখানে আর এসো না, ফোন করো না। তোমাকে আমি কোনোদিনও ভালোবাসিনি।

অবাক বিস্ময়ে কথাগুলো শুনলাম। একটু হাসলাম। তারপর নিজের বাড়িতে ফিরে এলাম নষ্ট আমি। আপন বিছানায় শরীরটাকে শুইয়ে দিয়ে ভাবলাম এই কি সেই পবিত্র আমি?

জুয়েলের কাছে বার বার একই প্রশ্নের উত্তর খুজেছি। তুমি জানতে আমাকে বিয়ে করবে না। ভালোবাসো না। তবে এই কাজ কেন করলে?

উত্তরে ও বলেছে একই কথা, তুমি তো চেয়েছো, না হলে চিৎকার দিলে না কেনো?

আসলেই ভাবি, কেন দিলাম না। তাহলেতো এই শরীরটা বেচে যেতো। নিজেকে অসতী, নষ্টা মনে হতো না। তারপর ভাবি, এ কষ্টটা আমার একান্তই নিজের। কিন্তু অন্যটা হলে তো সবাই জানতো। আমার বাবা-মা কোথায় দাড়াতেন?

এই হারানোর কষ্টটা আমাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু বাবা-মা কেউ বুঝবেন না। আমার মতো মেয়ের জন্য তারা কেন কাদবেন?

এরপরের দিনগুলো যে কিভাবে কাটিয়েছি তা বলার না। সব সময় পাগলের মতো কাদতাম। ঘুমাতাম না, খেতাম না। মোট কথা, এক অবর্ণনীয় কষ্টের সময় পার করেছি। এখন আর অতোটা কষ্ট হয় না। কাদতে ভুলে গেছি।

খুব মজার ব্যাপার হলো, ওর কাছে যেতাম মাঝে মধ্যে।

ও একই কাজ করতো এবং পরে আসার সময় খুব বিশ্রী ব্যবহার করতো। তবুও ওর প্রতি ঘৃণা আনতে পারতাম না।

জুয়েল আমাকে বলেছে যে, আমি ওর জীবনে প্রথম মেয়ে না। আমার আগেও ছয়টি মেয়ের সঙ্গে ও প্রেম নামের নাটকের নায়ক হয়েছে। আর পতিতাদের কাছে ও নিয়মিত যায়। চারশ টাকা দিয়ে ও প্রথম সাহেববাজারে একটা হোটেলে নিজের কুমারত্ব ছেড়ে দিয়েছিল। অবশ্য পুরুষদের কুমারত্ব বলে কিছু থাকে না। ওরও নেই।

কতোদিন পাগলের মতো ওর কাছে ছুটে গিয়েছি। ভেবেছি, ওকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকবো কিছুক্ষণ। যেখানে সেক্স নামের নোংরা শব্দটির স্থান থাকবে না, শুধু থাকবে ভালোবাসা। কিন্তু যেদিনই যাই না কেন ও প্রথমেই হুড়মুড় করে ওর বিছানায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতো এবং দুই সেকেন্ড পরেই ওর হাতটা চলে যেতো আমার বুকে, তারপর আরো নিচে।

কিছু করতে পারিনি। এতো খারাপ কথা জানার পরেও ওকে আমার নিজের চেয়ে বেশি ভালোবাসি কেন বুঝি না।

অনেক দিন হলো ওর কাছে যাই না।

শেষ যেদিন দেখা হলো সেদিন সে বললো, তোমাকে আমার কোনোদিন ভালো লাগেনি। আজও লাগে না। তোমাকে নিয়ে মজা করেছি। তোমাকে তো ভালোবাসি না। তুমি তো একটা বেশ্যা।

আমি সত্যিই এক বেশ্যা। তাই তো ওর এত অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করে ওকে আজও ভালোবাসি। ওর জন্য এখনো কাদি, এখনো কষ্ট পাই। মাঝে মধ্যে মনে হয় ও হয়তো এসে বলবে, সরি, আজ থেকে আমি তোমার হলাম।

আসলে ওরা তা বলে না। ওরা আমাদের নষ্ট করে। আবার ওরাই আমাদের বেশ্যা বলে। আমার মনে হয়, মেয়ে হয়ে জন্মে কি ভুলই না করেছি!

আমাদের সতীত্ব নিয়ে ভাবতে হয়। আমাদের কষ্টকে লোক লজ্জার ভয়ে মুখ ফুটে বলতে পারি না। বিচার চাইতে পারি না। নীরবেই কাদি। কি নির্মম পরিহাস।

শেষের দিন ওর বিবেক হয়তো একটু নাড়া দিয়েছিল। আমি দাড়িয়েছিলাম, ও আমার দুই পা জড়িয়ে ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

আমি সরে দাড়িয়েছি। ওকে ক্ষমা করবো না কখনো, কোনোদিনও না। ও কি আমাকে আগের মতো করে দিতে পারবে? যদি পারে তবে ওকে ক্ষমা করবো।

সমাজ ওদের শাস্তি না দিক, ঈশ্বর তো দেবেন! তিনি কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

সব সময় একটা প্রশ্ন মনে আসে, আমি কি ধর্ষিতা, নাকি স্বেচ্ছায় নষ্ট হয়েছি?

উত্তর খুজে পাই না।

নাম ঠিকানা বিহীন

ধূপি

- সাঈদ

সন্ধা সাতটা হবে। দিন শেষে ঘরে ফেরার মানুষের ব্যস্ততা। সাইকেল রিকশার টুং টাং শব্দ, বাস-ট্রাকের হর্নের সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। কাজলা মোড়ে হিরুর দোকানে বসে চা খাচ্ছি। এগারো বারো বছরের একটা মেয়ে এলো হঠাৎ কোথে কে। এসে ওর সুন্দর ঝকঝকে দাতের এক ঝলক হাসি উপহার দিল।

দেখেই মনে হবে ভালোবাসা কাড়তে জানে দারুণ।

এবার লজ্জা পেয়ে তার হাসি মুখটা দোকানের আলমারির কাচের বোয়মের নিচে লুকাতে চেষ্টা করছে। আমাদের দেখে আরো লজ্জা পেল সে। মাথা এমনভাবে নিচু করে আছে যেন পারলে কোনো গর্ত কিংবা আলমারির ফাকে নিজেকে লুকোবে।

চেহারাটাকে মুহূর্তে বিভূতি ভূষণের দুর্গার সাথে মেলাতে চেষ্টা করলাম। নাহ! দুর্গা এর চেয়ে আরো সাহাসী এবং বাকপটু।

চায়ে আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছি আর ওকে দেখছি। খুব মজা পাচ্ছি ওর লজ্জা পাওয়া মুখ এবং ব্যর্থ লুকানোর চেষ্টা দেখে।

মায়াভরা কণ্ঠে হিরু বললো, *কি নিবা আপু, বিস্কুট? ওঠো, ওঠো, বলো কি নিবা?*

একটা টাকা নিবো। এবার মাথা কিছুটা তুলে লুকোচুরি খেলে লজ্জার বাধ ভাঙলো মেয়েটা। মুখে সেই একই রকম সুন্দর ঝকঝকে হাসি।

হিরু তার হাতে এক টাকার একটা কয়েন তুলে দিতেই সে দ্রুত নিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল কোথায়।

চা শেষ করে বিল দিতে দিতে হিরুকে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটা কে? তোমার বোন মনে হয়?

হিরু উত্তর দিল, না তো, আমার কেউ না।

একটু কৌতূহল বাড়লো। ভাবলাম, দেখি তো খুজে পাওয়া যায় কি না মেয়েটাকে। মাত্র এক টাকার কি এমন আনন্দ কেনে মেয়েটা সেটা দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল আমার।

যেদিকে ও হারিয়ে গিয়েছিল সেদিকে গিয়ে একটু খুজতেই পেয়ে গেলাম মেয়েটাকে। একটা ধূপি (ভাপা পিঠা) বিক্রেতার সামনে দাড়িয়ে আছে। আরো চার পাচজন দাড়িয়ে দাড়িয়ে ধূপি খাচ্ছে।

গভীর অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছে সে।

আমি একটু দূর থেকে সব কিছু দেখছি।

সবাই খেয়ে চলে গেলে সে টাকাটা ধূপিওয়ালাকে দিয়ে একটা ধূপি চাইলো।

ধূপিওয়ালা খানিকটা বিরক্ত হয়ে বললো, *এক টাকায় ধূপি নাই, যা।*

মেয়েটা খুব করুণভাবে চলে যাচ্ছিল টাকাটা আবার হাতে নিয়ে।
এবার মেয়েটাকে ডাকলাম। ধূপিওয়ালাকে বললাম, ওকে দুইটা ধূপি দেন।
ওর নাম জিজ্ঞাসা করতেই জানালো, ওর নাম লাভলি।
লোকটার হাত থেকে ধূপি হাতে নিয়েই সে বললো, টাকা?
বললাম, তুমি যাও, ওটা আমি দেবো।
নির্মল হাসি উপহার দিয়ে চলে গেল মেয়েটা।

রাজশাহী থেকে

প্রমোশন

- এইচ আলী

আমার কৃশ্চিয়ান দিদি পেশায় একজন নার্স। চেহারা ঐশ্বরিয়ার মতো। দৈহিক গঠন কারিনার মতো। ঠোট দুটো ভূমিকার মতো। পরস্ত্রী হলেও তার শারীরিক গঠন ও কণ্ঠের মাদকতা তাকে আপন করে পাবার ইচ্ছা জাগায়। তাই কাজে একটু অবসর পেলেই তার সঙ্গে গল্প করতাম।
গল্পের ফাকে একদিন আক্ষেপ করে বললাম, কবে যে প্রমোশনটা পাবো? বেতন বাড়বে! আরো সচ্ছলভাবে চলবো!
দিদি কথায় কথায় বললেন, তোমার প্রমোশন যদি আমার হাতে থাকতো তাহলে কবেই তোমাকে দুটো অটো প্রমোশন দিতাম।
বললাম, আপনি ইচ্ছে করলে এখনই আমাকে একটি প্রমোশন দিতে পারেন।
দিদি একটু চিন্তিত হলেন এবং জানতে চাইলেন কিভাবে তিনি আমাকে প্রমোশন দেবেন।
বললাম, আপনি চাইলেই আমি আপনাকে *দিদি* থেকে *বৌদি* ডাকার প্রমোশন পেতে পারি।
আমার কথায় দিদি প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য আলাপে চলে গেলেন।
সেদিন ছিল বড় দিন। দিদি আমাকে তার বাসায় রাতের খাবারের নিমন্ত্রণ দিলেন।
যথাসময়ে তার বাসায় গেলাম।
দিদি দরজা খুলেই একটি রহস্যময় হাসি দিলেন।
ভাবলাম, আমার পোশাকে হয়তো কোথাও অসামঞ্জস্য চোখে পড়েছে দিদির। তাই নিজের দিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।
দিদি আজ খুব সুন্দর করে সেজেছেন। তীব্র পারফিউমের গন্ধ ঘরের বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। আসলে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো না।
আমি অস্বাচ্ছন্দ্য প্রকাশ করায় দিদি তাড়াতাড়ি জানালা খুলে দিলেন।
ডাইনিং টেবিলে পাশাপাশি প্লেটে অনেক লোভনীয় খাবার পেটে যাবার অপেক্ষা করছে।
ইতিমধ্যে দিদি শোকেসের ভেতর থেকে একটি শাদা খাম বের করে আমার হাতে দিলেন।
আমি খাম থেকে কার্ডটি বের করে পড়লাম।
তাতে লেখা আছে, *তুমি কি আজ রাতটি আমার জন্য বরাদ্দ করতে পারো?*
দিদির মুখের দিকে বোকার মতো তাকালাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, এর মানে কি?
দিদি হাসতে হাসতে তার পরনের শাড়িটি খুলে ঘরের এক কোণে ছুড়ে ফেলে বললেন, তোমাকে প্রমোশন দিলাম।
সেদিন দিদির প্রমোশন পেয়ে প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলাম।

ধামরাই, ঢাকা থেকে

বর্ষাবরণ

– ডা. ঝিনুক

টিনের চালে রিমঝিম বৃষ্টি পড়ার শব্দে ঘুম ভাঙলো। জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখতে পেলাম মুষলধারে অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে। বৃষ্টি পড়ার শব্দ টিনের চালে এক অপরূপ সঙ্গীত সৃষ্টি করে যা মনে এক অসম্ভব ভালো লাগায় ভরিয়ে দেয়। ইশ! এমন সময় যদি মুক্তা (ছদ্মনাম) পাশে থাকতো, তাহলে কি মজাই না হতো! অনেক গল্প–কথায় হারিয়ে যেতাম আমরা।

আজ আষাঢ়ের প্রথম দিন। এদিনটিতে বৃষ্টিভেজা মিস করা যাবে না কিছুতেই। সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তাকে ফোন করলাম।

হ্যালো, আসসালামু ওয়াআলাইকুম। মুক্তার মিষ্টি কণ্ঠ।

ওয়াআলাইকুম আসসালাম। শুভ প্রথম বাদল দিন।

সেকি! নববর্ষ, ভ্যালেটাইনস ডে, ফ্রেন্ডস ডে হয় শুনেছি। কিন্তু বাদল দিন তো শুনিনি।

আগে শোনোনি, এখন তো শুনলে। ষড়ঋতুর এই দিনটি আমার কাছে বিশেষ আলাদা। আজ আমরা ঘুরবো, বৃষ্টিতে ভিজে বর্ষাবরণ করবো।

ঝিনুক, তুমি পাগল হয়েছো নাকি? জানো তো আমার গলায় সমস্যা। বৃষ্টিতে ভিজলে আমার ঠাণ্ডা লাগবে না?

এমন দিনে তোমার সঙ্গ মিস করতে পারবো না। প্লিজ না করো না।

ঝিনুক, আমি তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। তোমার জন্য যেকোনো কিছুই করতে রাজি। আর এতো সামান্য বৃষ্টিভেজা! দেখি তোমার বাদল দিন কেমন উপভোগ্য হয়।

থ্যাংকস, এখনই সিটি কলেজের গেটে এসো। আমি অপেক্ষা করবো।

মুক্তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় এক বছর। প্রথমে বন্ধুত্ব, তারপর প্রণয়। এমন অপ্সরীর প্রেম উপক্ষো করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এক বছর না যেতেই ভয়ানক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আমরা এ অনিশ্চয়তা জয় করতে বদ্ধপরিকর। আগামী ভ্যালেনটাইনস ডেতে আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি। তখন এ রকম বাদল দিনে জানালার পাশে মুক্তার কোলে মাথা রেখে বর্ষা এনজয় করতে পারবো।

চট্টগ্রাম সিটি কলেজের গেটে এক তোড়া কদম ফুল নিয়ে মুক্তার জন্য অপেক্ষা করছি। পাশ দিয়ে চলে যাওয়া লোকগুলো রিকশার হুড থেকে মাথা বের করে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কদম ফুল অভূতপূর্ব কোনো বস্তু। তাকানোর ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে তারা পাগল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে নারাজ। হঠাৎ দূরে তাকাতেই চোখে পড়লো মুক্তার আগমন। কাচা হলুদ রঙের শাড়িতে তাকে ডানা কাটা পরী মনে হচ্ছে।

ওয়েলকাম মাই বৃষ্টিভেজা পরী। শুভ বাদল দিনে তোমার জন্য কদম ফুলের শুভেচ্ছা।

শুভেচ্ছা তোমাকেও। এখন চলো কোথায় যাবে?

রিকশায় উঠে পড়লাম। উদ্দেশ্য ফয়’স লেক।

আজকে ফয়’স লেক প্রায়ই জনমানব শূন্য। তারা হয়তো কবিগুরুর *নীল নবঘণে, আষাঢ় গগনে, ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে,* শিরোধার্য বাক্য বলে মেনে নিয়েছে। তবে কয়েকজন হকার গাছের নিচে চাতক পাখির মতো দাড়িয়ে আছে।

সুন্দর একটি বোট ভাড়া করলাম। মুক্তাকে পাশে বসিয়ে একটু দূরে চলে এলাম। এই জায়গাটায় লেকটা প্রায় ত্রিভুজ আকৃতি। দুই পাড় পাহাড় ঘেরা। অন্যদিকটি সবুজ দ্বীপ সদৃশ একটি পাহাড়। বাতাস না থাকায় বোটটি স্থির হলো। বৈঠা উঠিয়ে নিলাম।

বৃষ্টিতে মুখোমুখি বসে পরস্পরের হাত ধরে দুজনে উপভোগ করছি নৈসর্গিক প্রকৃতি। অবিরাম বৃষ্টিতে এতোক্ষণে আমরা কাকভেজা। ভেজা শাড়িটি মুক্তার গায়ে লতার মতো তাকে জড়িয়ে আছে।

ওর চোখে চোখ পড়তেই সে লাজুক চোখে চোখ নিচে নামালো।

ওর চিবুকে হাত দিয়ে মুখটি উপরে তুলে ধরলাম। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিতে জল কপালে, ঠোটে, চিবুকে জমা হয়েছে। মেঘের ফাক গলে আগত সূর্যরশ্মিগুলো সেই জলে তাকে আরো সুন্দরী করে তুলছে।

তোমার ঠোটে জমানো জল দেখে আমার প্রবল পিপাসা পেয়েছে।

বলতেই সে তার দুই হাত এক সঙ্গে প্রসারিত করে ধরলো। অজস্র বৃষ্টির ফোটা তার হাতে চুম্বন করে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করলো নিমেষেই। তারপর আমার দিকে বাড়িয়ে বললো, নাও, এবার মন ভরে তৃষ্ণা মেটাও।

আমিও বৃষ্টির ফোটার মতো তার হাতে ঝাপিয়ে পড়লাম। বৃষ্টির পানির স্বাদ এতো সুমিষ্ট এই প্রথম জানলাম। আমার তৃষ্ণা মেটেনি,বরং বেড়ে গিয়ে বৃষ্টির মতো তার শরীরের উষ্ণতা নিতে ইচ্ছে করলো।

মুক্তার নীরব সম্মতি। তারপর ভেজা শরীরে উষ্ণতার ছোয়া।

এভাবে কতোক্ষণ ছিলাম জানি না। হঠাৎ মেঘের ডাকে হুশ হলো। ভয়ের বদলে মুক্তার মুখে হাসি। কারণ আমার মুখে লাল লিপস্টিকের ভালোবাসার অসংখ্য সীলমোহর।

এমন মুহূর্তটি আরো স্মরণীয় হয়ে থাকবে যদি তুমি একটি গান শোনাও। আমার অনুরোধ।

মুক্তার কোলে শুয়ে তার কণ্ঠে শোনলাম তপন চৌধুরীর

আকাশের সব তারা ঝরে যাবে,
আমার চোখের তারা ঝরবে না,
তোমাকে দেখার সাধ মরবে না গো,
তোমাকে দেখার সাধ মরবে না ...।

গান শেষ হতেই আমার কপালে একটি উষ্ণ পানির ফোটা অনুভব করলাম। চেয়ে দেখি ওর চোখ বৃষ্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এ অশ্রু আনন্দের, এ অশ্রু ভালোবাসার। মুক্তার চিবুক স্পর্শ করে বললাম, প্রিয়তমা, হয়তো আর অল্প কিছু দিনের অপেক্ষার পালা। তারপর আমাদের একটি বাড়ি হবে। বাসার সামনে ছোট্ট একটা লন যেখানে আমাদের একমাত্র মেয়ে দৌড়-ঝাপ করবে। মা, মা চিৎকারে তোমার কোলে ঝাপিয়ে পড়বে। তোমার মুখে ফুটে উঠবে সেই মুক্তা ঝরা হাসি। আর আমি তখন জানালার পাশে বসে আরেকটি বাদল দিনের প্রহর গুণবো। এমন একটি বাদল দিনে আমাদের ছোট্ট লনে আমাদের একমাত্র সন্তানের হাত ধরে আমরা বৃষ্টিতে ভিজবো। তুমি আমাদের গেয়ে শোনাবে, *বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল, আমায় করেছো দান ...*।

মুক্তা আমার বুকে মাথা রাখে।

আমিও তাকে বিশ্বস্ততার পরশে জড়িয়ে ধরি।

ঢাকা থেকে

রানী

– এস

তার নাম রানী। একজন তরুণী গৃহবধূ। এই গল্পের নায়িকা তিনি। সম্পর্কে রানী খুব কাছের না হলেও খুব দূরেরও নয়, এমন সম্পর্কের আমার ভাবী। আমি বলি, রানী আমার বন্ধু, আমার অনুপ্রেরণার উৎস।

বয়সে রানী আমার থেকে ছয় সাত বছরের বড়। মনের দিক থেকে তিনি আমার চেয়েও আধুনিক। তার স্বামী প্রবাসী। দুই সন্তানের জননী এই চঞ্চল তরুণী গৃহবধূর সঙ্গে আমার পরিচয় তখন থেকেই যখন তার বিয়ে হয়।

রানী যখন এখানে বৌ হয়ে আসে, তখন কতোইবা তার বয়স? কৈশোর আর যৌবনের মাঝামাঝি স্নিগ্ধ চেহারার এক তরুণী। গায়ের রঙ দুধে–আলতায় মেশানো। চোখে জোড়া ভুরু। সেদিনের সেই নববধূর সঙ্গে যে কিশোরের পরিচয় ছিল, সেই কিশোর সময়ের আবর্তে আজকের পরিণত যুবক আমি। দুই সন্তানের জননী হওয়ার পর থেকে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

ততোদিনে আমি কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিয়েছি।

একদিন তিনি পুকুরে গোসল করতে আসেন।

তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করি, বাড়িতে বাথরুম আছে। তবুও পুকুরে গোসল করতে এসেছেন। মনে হচ্ছে, পুকুরের পানিতে গোসল করতে বেশি ভালো লাগে?

হ্যা, সেই পুকুরটা যেহেতু তোমাদের, তাই আরো বেশি ভালো লাগে। তার সংক্ষিপ্ত জবাব।

তাই নাকি? তা আমাদের পুকুরের পানি ভালো লাগার বিশেষ কোনো কারণ আছে কি? আমার ব্যঙ্গাত্মক প্রশ্ন।

তোমাকে ভালোলাগে তাই, তোমাদের পুকুরের পানিও ভালোলাগে, তার সহজ উত্তর।

শুনে মনে হলো, ব্যঙ্গ দ্বিগুণ হয়ে আমার কাছে ফিরে এলো।

আমাকে ভালো লাগার জন্য ধন্যবাদ। আপনার ভালো লাগার তালিকায় আর কি কি আছে জানতে পারি? আমার পাল্টা প্রশ্ন।

তোমাদের বাড়ি, তোমাদের বাড়ির মানুষ, সব ভালো লাগে। তার কণ্ঠে হেয়ালির সুর।

তাই নাকি? আপনি যে বাড়ি থাকেন সেই বাড়ি বুঝি ভালো লাগে না? আর রাতে যার সঙ্গে এক খাটে ঘুমান তাকে কি একটুও ভালো লাগে না?

তুমি তো খুব দুষ্টু।

এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না।

যদি বলি, ভালো লাগে না।

আমি বলি, কেন ভালো লাগে না?

তা তোমার জেনে কি দরকার?

কেন, আমি কি জানতে পারি না?

এভাবেই শুরু সদ্য বয়ঃসন্ধি উত্তীর্ণ এক কিশোর দেবরের সঙ্গে তরুণী ভাবীর দুষ্টুমি, ঝগড়া, অভিমান এবং শেষে বন্ধুত্ব।

একদিন সকালে ক্লিন শেভড হয়ে রানীর কাছে যাই। বলে রাখা ভালো, রানী যেখানে থাকে সেখান থেকে আমাদের বাড়ির দূরত্ব পাচ মিনিটের পথ হলেও যখন ইচ্ছা তখন তার সঙ্গে দেখা করতে পারি না। তার স্বামী প্রবাসী হওয়ায় তার ওপর শ্বশুর–শাশুড়ির অঘোষিত নজরদারি কাজ করেন।

তিনি আমাকে দেখে প্রথমে যে কথাটা বললেন তা হচ্ছে, আজ তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।

ধন্যবাদ। আপনি জানেন কি, আপনাকে আমার চোখে সব সময়ই সুন্দর লাগে?

আমার এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাকে সুন্দর লাগলে কি হবে। আমি তো একজনের হয়ে গেছি। আমার কোনো ছোট বোন নেই। থাকলে তোমাকে দিতে পারতাম।

রানীভাবীর সঙ্গে এভাবে কথাচ্ছলে দুষ্টুমি চলছে।

এর বছর খানেক পরের কথা। হঠাৎ মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি এলো। তাকে একটা যৌন শিক্ষা বিষয়ক ম্যাগাজিন কিনে দিলাম।

পরদিন যখন দেখা হলো।

তিনি বললেন, তোমার ম্যাগাজিন নিয়ে যাও।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, এটা ভালো লাগেনি? আরো কড়া ডোজের একটা এনে দেবো?

মুখে ভেংচি কেটে তিনি বলেন, না জনাব, এটা পড়েই আমার আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেছে, আর দরকার নেই। এটা নিয়ে যাও, যদি কোনো গল্পের বই এনে দাও, পড়বো।

আপনার ঘরে রাখার জায়গা না থাকলে পানিতে ফেলে দেবেন। আমি কাউকে কিছু দিয়ে ফেরত নিই না বলে সেদিনের মতো চলে আসি।

কিছু দিন পর আবার তার সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বললেন, *নাইট ডিউটিটা ছেড়ে দিও, স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে।*

তার এ কথায় হাসবো, না লজ্জায় মুখ ঢাকবো বুঝতে পারলাম না। ধাতস্থ হয়ে তাকে বললাম, তাই নাকি? আপনারও *নাইট ডিউটি*–র অভ্যাস আছে নাকি না হলে বুঝলেন কি করে?

আছে বৈকি। না থাকলে দুটো বাচ্চা হলো কি করে?

তা বুঝলাম। নাইট ডিউটি করার জন্য অবশ্যই পার্টনার দরকার। আপনার পার্টনার আছে। আমার নেই। আমি কার সঙ্গে ডিউটি করি?

আমি কি করে জানি?

তাহলে বললেন কিভাবে?

বিড়ালের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় কোনটি ভাজা মাছ খায়।

আপনি বলতে চান, আমি ভাজা মাছ খাই? তাহলে নিশ্চয়ই দুই একদিন আপনার হাড়ির ভাজা মাছ খেয়েছি?

তার মানে?

খুব সোজা। ডিউটিটা আপনার সঙ্গেই করেছি।

তুমি এতো দুষ্টু! তুমি জানো, তুমি কি বলেছো?

হ্যা জানি। তেমন কিছুই বলিনি।

বাদর। তোমার সঙ্গে আর কোনো কথা নয়, আড়ি।

কথা না বলে থাকতে পারবেন?

ঢের পারবো। দেখা যাক না কে আগে কথা বলে।

তার এই স্বঘোষিত আড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম না কয়েক মাস ইচ্ছে করেই।

একদিন প্রয়োজনে তাদের বাড়ি যাই।

রান্নাঘরে তিনি রান্না করছেন। তার পরনে গোলাপি রঙের শাড়ি কাপড়। রান্নাঘরের ধোয়ার মাঝেও তাকে চমৎকার লাগছিল।

আমাকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছো?

ভালো। আগে কথা বলে আপনি হেরে গেলেন।

আমি কি সত্যি সত্যি আড়ি ধরেছি নাকি!

তাহলে এতো দিন কথা না বলে আমাকে কষ্ট দিলেন কেন?

তুমি এতো দিন কথা বলোনি, আমারও কি কম কষ্ট হয়েছে?

কষ্ট হতে আপনার বয়েই গেছে। আমি অতোসব বুঝি না। শর্ত অনুসারে আপনি আমাকে জরিমানা দিতে বাধ্য।

কতো টাকা?

টাকা নয়, চুমু।

আবার দুষ্টুমি হচ্ছে?

দুষ্টুমি নয়, সত্যি বলছি, আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে আপনার গোলাপি ঠোট দুটো চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিই।

চুমু খাওয়ার খুব শখ? একটা বিয়ে করো। তারপর যতো ইচ্ছা বৌকে চুমু খেও।

তা আপনাকে বলে দিতে হবে না। এখন বলুন জরিমানা দেয়ার জন্য আপনি প্রস্তুত কি না।

মনে হচ্ছে তুমি জোর করে জরিমানা আদায় করতে চাও?

হ্যা এবং এক্ষুণি।

না, এখন নয়। কেউ দেখে ফেলবে।

কখন?

পরে। যখন কেউ দেখবে না।

তাহলে বিকেলে আমাদের বাড়ি যাবেন?

সুযোগ পেলে যাবো।

না। বিকেলে তিনি এলেন না। তার পরিদিনও না। পরের সপ্তাহেও না।

তার স্বামী প্রবাস থেকে ছুটিতে দেশে এসেছেন। ইচ্ছে সত্ত্বেও তার সঙ্গে মাস দুয়েক দেখা হলো না।

দুই মাস পরের কথা। তার স্বামী প্রবাসে ফিরে গেছেন।

এক বিকেলে তিনি আমাদের বাড়িতে এলেন। মা, বাবা দুজনেই বাইরে কাজে ব্যস্ত।

তাকে আমার বেডরুমের খাটে বসতে দিই। তার পরনে কমলা রঙের শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ। পড়ন্ত বিকেলে ঝলমলে রোদের আলোর মাঝেও তার চোখ–মুখ, শরীর দিয়ে যেন সৌন্দর্য ঝরে পড়ছে।

লো ভলিউমে ক্যাসেট প্লেয়ার অন করে দিই। জগজিৎ সিং–এর কণ্ঠে বাজতে থাকে, *আজ কিছু হতে চলেছে।*

তাকে জিজ্ঞাসা করি এ দুই মাস কেমন কাটলো? নিশ্চয়ই ভালো?

না। ভালো না। বাকা ঠোটে হেসে তিনি বলেন।

আপনার চেহারা তার উল্টোটা বলছে।

আমার এ প্রশ্নের জবাবে রহস্যময় হাসি দিয়ে নীরব থাকেন তিনি। নীরবতা ভেঙে প্রসঙ্গ পাল্টে বলি, আপনার কাছে জরিমানা স্বরূপ কিছু একটা পাওনা আছি। এখন তা সুদে–আসলে দ্বিগুণ হয়েছে।

কি পাওনা আছে?

মনে করে দেখুন।

তুমি মনে করিয়ে দাও।

যে ভুলে যায় তাকে বলি না।

আমি তোমার মুখে শুনতে চাই।

চুমু।

সুযোগ নেই। কেউ দেখে ফেলবে।

মা, বাবা বাইরে ব্যস্ত। বাড়িতে আর কেউ নেই। এখন কেউ দেখবে না। যা করার তাড়াতাড়ি করুন।

ঠিক আছে। তুমি ইচ্ছে মতো আদায় করে নাও।

না, আপনিই দিন।

আমি দিলে তোমার পছন্দ হবে?

আগে দিন, পছন্দ না হলে আদায় করে নেবো।

বসা থেকে তিনি উঠে দাড়ালেন। দুই হাতে আমাকে জাপটে ধরেন। তার দুই ঠোট দিয়ে আমার দুই ঠোট জড়িয়ে ধরে মুখে পুরে চকলেটের মতো চুষতে থাকেন। আমার ঠোটে তার ঠোটের জাদু ছড়িয়ে আমাকে উন্মাদ করে দেন।

মুহূর্তে, ভুলে যাই তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক, বয়সের ব্যবধান সব। তার চুমুর জবাবে তার দুই ঠোট, চিবুক, কপাল সব চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে থাকি। তার বুক দুটো আমার বুকে বিধতে থাকে।

এক সময় আমার হাত তার বুকে বসিয়ে দেন।

অপরূপ সৌন্দর্য তার বুকের মাঝে। তার বুকের সৌন্দর্যের মাঝে আমি হারিয়ে যাই। আর তার মুখ দিয়ে অদ্ভুত সুখের ধ্বনি বের হতে থাকে।

হঠাৎ বাইরে থেকে আমার ডাক পড়ে।

তিনি নিজেকে মুক্ত করে দ্রুত সামলে নেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

চলে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে বললেন, আজকের রাতটা স্বপ্নের মতো যাবে।

বললাম, কেন? এমন তো আপনার ক্ষেত্রে খুবই বাস্তব।

আসলে আজকের রাতটা খুব কষ্টে কাটবে। এটুকুতে নেভানো আগুন আরো জ্বলে ওঠে। সে বললো।

আরো কিছু চান?

তোমার এই প্রশ্নের উত্তর এখন দেবো না।

তিনি একটু মুচকি হেসে চলে গেলেন।

কেরানীগঞ্জ, ঢাকা থেকে

অপারগ

- স্মিতা

তারিখটা ছিল ১০ ডিসেম্বর ২০০২। ২০০৩-এর মে মাসে আমার 'এ' লেভেল পরীক্ষা। তাই খুব পড়াশোনা করছি। কারণ বাবার আশা, আমার 'এ' লেভেলের রেজাল্ট 'ও' লেভেল-এর মতোই খুব ভালো হবে অর্থাৎ সব A।

এমন সময় আমার এক দূরসম্পর্কীয় চাচা আমাদের বাড়ি এসে হাজির। দূরসম্পর্কীয় হলেও খুব ঘনিষ্ঠ। তাই তাকে দেখে খুব খুশি হলাম। তিনি থাকেন রাজশাহী উপশহরে। বাবাকে তিনি অনুরোধ করলেন, একবার সেখানে যাবার জন্য।

কিন্তু বাবা খুবই ব্যস্ত আর বাবাকে ছেড়ে মা যাবেন না। তাই বাবা প্রস্তাব দিলেন আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

পড়তে পড়তে একঘেয়ে লাগছিল আর কখনো রাজশাহী যাইনি। রাজি হয়ে গেলাম এবং সঙ্গী হিসেবে নিয়ে নিলাম আমার বেস্ট ফ্রেন্ড রবিকে। ঠিক হলো রাজশাহীতে আমরা সাত দিন থাকবো।

যাহোক, আমরা রাজশাহীতে পৌছালাম।

একদিন আমি, রবি ও আমার চাচাতো ভাই রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছি। হঠাৎ আমার চোখ পড়লো এক যুবকের ওপর। বয়স আন্দাজ বিশ বা একুশ। চেহারা অতি সাধারণ, উল্লেখযোগ্য কিছু না। কিন্তু কেন যেন সেই ছেলেটির প্রতি আমার খুব কৌতূহল হলো।

আমার ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি রে, চিনিস নাকি?

ভাইয়া বললেন, (ভাইয়ু বলে ডাকি) হ্যা! এটা তো মামুন! এই পাড়াতেই থাকে। কেন বল তো?

না এমনি। আচ্ছা, এর সম্পর্কে আমাকে কিছু খবর জোগাড় করে দিতে পারবি ভাইয়ু?

ভাইয়ু হা হা করে হেসে বললেন, কেন পছন্দ হয়েছে নাকি?

বললাম, না না এমনি!

ভাইয়ু হাসি মুখে বললেন, এমনি? সেটা তোর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এক সপ্তাহ সময় দে। সব জেনে বলছি।

তারপর ঢাকা ফিরে আসি। কিন্তু কিছুতেই সেই মামুন নামের ছেলেটির চেহারা ভুলতে পারছি না। ঢাকা এসেছি দুই সপ্তাহ হয়ে গেছে। তবুও ভাইয়ুর কোনো খবরই নেই।

একদিন হঠাৎ ভাইয়ু ঢাকায় এলেন এবং একটা কাগজে A থেকে Z পর্যন্ত সব খবর পেলাম মামুন সম্পর্কে।

তার ফোন নাম্বার পেয়েই তাকে ফোন করলাম।

প্রথমে কথাই বলতে চাইলো না। কেনই বা বলবে? আমাকে তো চেনে না!

কিন্তু আস্তে আস্তে হয়ে গেল বন্ধুত্ব। শুধু ফোনে কথা বলেই এক সময় ভালোবেসে ফেললাম তাকে।

সে যে, আমাকে ভালোবাসতে চায় না! অবশেষে হাল ছেড়ে দিলাম।

এর মধ্যে আমার ছেলেবেলার এক বন্ধু ফেরত এলো আমেরিকা থেকে। এসেই বাবার কাছে আমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল।

বাবা এক কথায় রাজি। ঠিক হলো আমার পরীক্ষার পর বিয়ে হবে। তারপর বাফেলো ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেষ করবো। আমি যে, আরেকজনকে ভালোবাসি! যদিও সে আমাকে বন্ধুর বেশি কিছু ভাবতে চায় না, তাই অনেক পীড়াপীড়িতে আমিও অতি কষ্টে রাজি হলাম।

আমার বিয়ের কথা বলার জন্য মামুনকে ফোন করলাম।

কিন্তু সেদিন ও একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলো। ফোন ধরে বললো, আই লাভ ইউ।

কিন্তু হায়! এখন যে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তবুও আমার বড় তিন ভাইকে সব কথা বলি।

তারা শুনে রেগে আগুন। বললেন, যদি ওকে না ভুলি তবে ওর ভয়ানক কোনো ক্ষতি করে ফেলবে ওরা।

চুপ করে গেলাম। কারণ আমার ভাইয়েরা দেশের বাইরে থাকলেও ঢাকায় তাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি এবং চাইলে তারা যা খুশি তা করতে পারে।

ভয়ে মামুনকে ফোন করা বন্ধ করে দিলাম। নিজের ফোন নাম্বার ও ই-মেইল অ্যাড্রেস বদলে ফেললাম।

মে মাসে পরীক্ষা হলো। রেজাল্ট আনলাম সব A, শুধু একটা A মাইনাস। TOEFL দিলাম, SAT I-II দিলাম। বাফেলো ইউনিভার্সিটি থেকে I-20 এলো।

আমার বিয়ে হয়ে গেল।

ঘটনাগুলো ঘটলো খুব দ্রুত। ২০০৩-এ আমেরিকায় এসে ক্লাসে জয়েন করলাম।

এক বছর পরে ফিরলাম বাংলাদেশে। দেখলাম এই এক বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে।

বদলে গেছি আমিও। বুঝতে পেরেছি এমন একজন মানুষের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে যে আমাকে ভীষণভাবে ভালোবাসে। তাই সে আমার অতীত দিনের কথা শুনে বলেছে, যদি চাও তবে তুমি এবার ঢাকায় গিয়ে মামুনের সঙ্গে দেখা করতে পারো।

কিন্তু আমি চাই না। কারণ আজও মামুনকে খুব ভালোবাসি এবং জানি আমি যদি এখন ওকে সামনে পাই তাহলে আমার পেছন ফিরে তাকানো কষ্টসাধ্য হবে। হয়তো পারবোই না।

ঠিকানা বিহীন